ভূমিকা।

দ্বাপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের সময় আচার্য্যদেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কলিকাতায় থাকিয়া ক্রমে শরীর আরও খারাপ হইতে থাকে। কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইলে, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক—৪ঠা জুন, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে দার্জ্জিলিং গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালীন অনেক প্রেরিত প্রচারকও তথায় গমন করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আচার্য্যদেবের জীবিকা কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়?" আচার্য্যদেব ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও "তাঁহার জীবনের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ।" তখন তিনি স্বীয় জীবনের গভীর তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ২২শে জুন, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ—সেখানে উপাসনার পর "জীবনবেদ" বিষয়ে প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা জীবনবেদের চতুর্থ সংস্করণে, প্রথমেই দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে স্থান সম্বন্ধে কমলকুটীরের উল্লেখ ছিল, কিন্তু এ প্রার্থনা দার্জ্জিলিংএ হয়। কারণ ২২শে জুন তারিখে তিনি দার্জ্জিলিংএ ছিলেন। পরপৃষ্ঠায় সেই প্রার্থনা প্রদত্ত হইল;—

আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনা।

দার্জ্জিলিং।

জীবন-বেদ।

বৃহস্পতিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ; ২২শে জুন, ১৮৮২ খৃষ্টা

"হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ত্র বলিয়া চারিদিকে খুজিয়া বে
কিন্তু শাস্ত্র আপান। অনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে অনন্ত বেদক
কিন্তু জীবন-বেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র আর কৈ ?
পড়ি তত জ্ঞানী হই, যত বুঝি তত মোহিত হই। হে গুরু, জী
পুস্তকে যে সমুদয় তত্ত্ব পড়াইলে, বুঝাইলে, সে সমুদয় অতি আশ
তত্ত্ব। দয়াময়, এ বই কিন্তু তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে ভুল না
আমার জীবন-পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। পদ্যগুলি কি সুমিষ্ট,
ভাবে পূর্ণ! গদ্যগুলি কি নীতিপূর্ণ, কি গম্ভীর! পরমেশ্বর, এ
এক এক গ্রন্থ তোমার এক এক লীলা! তোমার জ্ঞান, প্রে
বাৎসল্য, পুণ্য, এক এক খণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। তুমি নিজ হস
কলম ধরিয়া লিখিতেছ। পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই। গুরু
তুমি, লেখক তুমি। পাঠক চাই। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি
কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। দয়াময়, আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন
এই জীবন-গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই নববিধান
গ্রন্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। এ গ্রন্থ কেন আমরা
ভাল করিয়া পড়ি না? যেমন লেখা, তেমনই ভাব, তেমনই ভাষা,

২৬শে আষাঢ়, ১৮০৪ শক—৯ই জুলাই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ
দেব দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন
মাসাধিক কাল থাকিয়াও স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি ল
না। ভগ্ন শরীরেই ফিরিয়া আসিলেন, এবং ৮ই শ্রাবণ, ১
২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মম
জীবনতত্ত্ব বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহস্থ প্রচা
নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র উহা লিপিবদ্ধ করেন। নববিধান মণ্ড
নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মূল জীবন-বেদের সঙ্গে মিলাইয়া ইহা মুদ্রিত হই
সংস্করণ সমূহে অনেক ভুল ছিল। এবং স্থানে স্থানে বাদও প
সে সমস্ত সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বে তারি
না, তারিখ দেওয়া হইল, এবং পাঠের সৌকর্য্যার্থে প্যার
দেওয়া হইল।

কমলকুটীর।
১লা এপ্রিল, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

গণেশ প্রসাদ

সূচীপত্র।

জীবন-বেদ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

অনেক দিন হইল, এই বেদী হইতে জীবন-পুস্তকের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে। সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আপনার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্য-জীবনকে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করেন। সেই জন্য পরম পিতার আদেশে এই বক্তার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই লোকেশ, গণেশ, পরেশ, মহেশ যিনি, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারবার প্রণাম করিয়া, এই সুমিষ্ট মধুময় কার্য্যে [illegible]ত্ত হই।

আমার জীবন-বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটী ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি জানি না ও ধর্ম্মসমাজ কোথায় কেহ দেখায় নাই; গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই; জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। কেন কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করিবে, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিলনা। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ভিত্তিস্থাপনের সময় কে অট্টালিকার সৌন্দর্য্য চিন্তা করে? কি রং দিব বারাণ্ডায়, তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটলভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়।

"প্রার্থনা কর, বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে, যাহা কিছু অভাব পাইবে", এই কথাই জীবনের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তরদিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। এই ভাবনারই ভাবুক হইয়াছিলাম, এই কর্ম্মেরই কর্ম্মী হইয়াছিলাম। প্রার্থনা গুরু, অসহায় জনের অপার সহায়। এই একজনকেই চিনিয়াছিলাম; একজনের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছিল; আর কাহাকেও জানিতাম না। ধর্ম্মবন্ধু কেহ ছিল না। আকাশের দিকে তাকাইতাম, কোন বিধানের কথা

শুনিতাম না, কোন ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতাম না। গির্জ্জায় যাইব, কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব, কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী; বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না। চক্ষু দ্বারা বিচার করিলাম। হইয়াছে কি?— বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। "হইয়াছে, আরও চল"— এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটা, আর রাত্রিতে একটা, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঊষা হইতে প্রাতঃকালে আসিলাম। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে, পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। পথ ঘাট, বাড়ী ঘর, সকল দেখা গেল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কি কথার বল! কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়! পাপকে খুঁসি দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভনকে ভয়ানক সঙ্কল্পের মূর্ত্তি দেখাইতাম। প্রার্থনা করিব বলিলেই সব ভয় পাইত।

যেমন আব্দার করিয়া বসিতাম ঠাকুরের পদতলে, কিছু লইতাম। কিছু পাইতে হইবে, কে দিবে? কোথায় যাইতে হইবে? কে পথ দেখাইবে? পাপকে কে দূরীভূত করিবে? সকল বিষয়েরই সহায় প্রার্থনা। তখন একমাত্র প্রার্থনা-ধনই ছিল; তাহারই উপর কেবল নির্ভর করিতাম। সুখের প্রত্যাশা করিতাম, প্রার্থনার নিকট। সাহায্য পাইতে হইলে, প্রার্থনার আশ্রয় লইতাম।

"সবে ধন নীলমণি" যেমন কথায় বলে, প্রার্থনা আমার তেমনই ছিল। তোমাদের বন্ধু কেবল একটী পরম সহায় পাইয়াছিল। কি পুস্তক পড়িতে হইবে, কি আলোচনা করিতে হইবে, কার কাছে যাইতে হইবে, কিছুই জানিতাম না। সে অবস্থায় না ফেলিলে, এত বিশ্বাস বোধ হয় প্রার্থনার উপর হইত না। কেহ কিছু বলিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিতাম "প্রার্থনা! কোথায় রহিলে? বিপৎকালে কাছে এস।" আমি বাঙ্গালা ভাল জানিতাম না যে, ভাষাবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করি। ভাব রাখিতে পারিতাম না। জানালার ধারে বসিয়া চক্ষু খুলিয়া একটী কথা বলিতাম। তাহাতেই আনন্দ ভারি। এক মিনিটে মহামূল্য রত্নলাভ। রত্ন পাইয়া কাকে দিব, কার কাছে গিয়া বলিব? তখন এমনই করিয়া সময় গেল। এই জনাই প্রার্থনাকে এত ভালবাসি।

তোমরা যেমন বন্ধু, প্রার্থনা আমার তদপেক্ষা বন্ধু। যদিও অদৃশ্য, তথাপি তাহাকে আমি বন্ধু বলিয়াই জানি। বোধ হয়, এখানকার সকল লোক অপেক্ষা আমি অধিক ঋণে প্রার্থনার কাছে আবদ্ধ আছি; কেন না এমন সময় ছিল, যখন আমার প্রার্থনা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ম্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম্ম প্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন। স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব, প্রার্থনাই তাহার নির্দ্ধারণ করিতেন। টাকার সহিত কিরূপ সংস্রব, প্রার্থনাই তাহার ব্যবস্থা

করিতেন। আদেশের মত বড় তখন ভাবিতাম না। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়, এই জানিতাম। বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল, প্রার্থনা করিয়া যেন দশবৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাকে ঈশ্বর বলিতেন, "তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর।" প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। কই, কাজ ছাড়িব কি না, বলিলে না? উহা কিরূপে হইবে, জানাইয়া দিলে না? কেবল এইরূপ করিতাম। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা প্রার্থনা মানি বলিয়াই বন্ধুদিগের অবস্থা মন্দ দেখিতেছি।

প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা আমাদের মণ্ডলী হইতে দূর করা আবশ্যক। যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না, সে প্রবঞ্চক। যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটা সে সময় ঠিক রাখে না, সে প্রবঞ্চক। প্রার্থনার অবস্থা বড় কঠিন অবস্থা। যে বহু ভাষার স্রোতে চলিয়া যায়, সে প্রবঞ্চক। সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই; রবিবারে কি বলিয়াছে, মঙ্গলবারে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আর বলিতে পারে না; সে প্রবঞ্চক। ধন মানের জন্য, সংসারের জন্য, কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনর আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি, একটী পয়সা সংসারের জন্য যে

চাহিবে, তাহার সমস্ত প্রার্থনা বিফল হইবে ; এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক, পরলোক, সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

এক, দুই, তিন, চার, ঠিক দিয়া তেরিজ কসিয়া যেমন অভ্রান্তরূপে কি হইল বলা যায়, প্রার্থনার সত্যও তেমনই করিয়া বোঝান যায়। এই আমার ছিল না, আমি পাইয়াছি ; আমি এই এখানে ছিলাম না, আসিয়াছি। এই জন্য বার বার বলি বন্ধুদিগকে, যার বাড়ীতে রোগ, বিপদ, কি টাকা কড়ির জন্য কষ্ট হইতেছে, তার প্রার্থনার বড় ভাল অবস্থা। বিপদের সময় প্রার্থনা খুব হয়। যখন যার অবস্থা পীড়া দেয়, তখন হাসিতে হাসিতে গিয়া সে যদি বলে, "আমার কিসের দুঃখ ? আমাকে ইহার মধ্যে বৈরাগ্য শিক্ষা দাও," তাহা হইলে যাই বলিবে ভক্ত, অমনই তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে। আসিবে প্রার্থনা করিয়া, আর শান্তি স্থাপন হইবে। বন্ধুদিগকে এইজন্য কেবল প্রার্থনা করিতে বলি। বন্ধুরা করেন না, তাই কষ্ট পান। এই জীবনের প্রথম কথা বর্ণন করিলাম। প্রার্থনা কি বস্তু, তাহা জানিয়া প্রার্থনার আদর করিলাম। সকলেই স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া, ধর্ম্ম-গ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সার বস্তু জানিয়া, এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাপবোধ।

রবিবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ৩০শে জুলাই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরের কথা কি? প্রথম প্রার্থনা। জীবন-গ্রন্থের দ্বিতীয় কথা কি? ভক্তবৃন্দ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় কথাও গুরুতর কথা। এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনেক অনৈক্য দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল : অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া, আমার পাপবোধ হয় নাই। পাপ দর্শনে প্রাণেবোধ হইল ; পলকের মধ্যে সহজে পাপ বোধ করিলাম। যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সে অবস্থায় আর কেহ গুরু হইয়া, পাপবোধ করিয়া দেয় নাই ; আপনার পাপের প্রবলতম সাক্ষী আপনিই হইলাম। 'আমি পাপী, আমি পাপী,' মন কেবল এইরূপই বলিত। প্রাতঃ-কালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় যদি কোন কথা বলিত, তাহা আর কিছুই নয়—কেবল বলিত, আমি পাপী। প্রাতঃকালে, পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে, অষ্টপ্রহরই—যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতাম, ততক্ষণই পাপবোধ। চুরী, ডাকাতি, পরদ্রব্যহরণকে পৃথিবীর অভিধানে পাপ বলে। যিনি তোমাদের নিকট এখন কথা কহিতেছেন, ইঁহার অভিধানে পাপ গ্লানি, পাপ ব্যাধি, পাপ অসুস্থাবস্থা, পাপ দৌর্ব্বল্য, পাপ পাপ করিবার সম্ভাবনা। আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।

আভিধানিক অর্থ নিজে করি নাই; যখন বিবেকের আলো হৃদয়ে পড়িল, দেখি শতাধিক সহস্রাধিক ছোট ছোট বস্তু রহিয়াছে। স্থূল সূক্ষ্ম অনেক বস্তু আছে। জড়তা, দৌর্ব্বল্য, আসক্তি কতই হৃদয়ের ভিতরে। আত্মার মধ্যে সব এমনই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল যে, বিবেকের আলো না জ্বলিলে কিছুই দেখা যাইত না। এক এক দিন যেমন মন্দিরে গ্যাসের আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বিবেকের আলো তেমনই করিয়া হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। দেখি, কেবলই পাপ। শরীর যখন আছে, কাম ক্রোধাদির মূলও আছে। এ কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সে মত মানি না, যে মতে পাপেই মানুষের জন্ম নির্দ্দেশ করে। পাপের সম্ভাবনায় জন্ম, ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে। আমি পাপ করিতে পারি। কি করিতে পারি? মিথ্যা কথা বলিতে পারি; চুরী করিতে পারি। চুরী করিতে পারি? সে কিরূপ? যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি 'আমার হয়, তাহার না থাকে', এক মিনিটের জন্যও এরূপ ভাব আসিল, তবেই চুরী হইল। মিথ্যা কথা বলিতে পারি, কিরূপ? যদি কখনও প্রাণের দায়ে পড়ি, নিশ্চয় যদি না হয়, হয় ত মিথ্যা বলিতে পারি। মিথ্যাও যদি না বলিতে পারি, হয় ত এমন কথা বলিতে পারি, যাহা স্পষ্ট মিথ্যা না হোক, শ্রোতার মনে মিথ্যা ভাব উৎপন্ন করিতে পারে। মিথ্যা বলিতে পারি কিরূপ? কথায় নয়, মনেতে। তবে কি আমি চোর? হাতে নয়, হৃদয়েতে।

এইরূপ আমি যাহা আছি, তার চেয়ে যদি আপনাকে বড় মনে করি, তবেই অহঙ্কার-পাপ হইল। তুমি লেখা পড়া কম জান, আমি

জানি বেশী, এইরূপ মনে হইলেই পাপ। মনের ভিতর আপনাকে যদি অধিক ভালবাসি, অন্যকে ভালবাসা যদি কম হয়, আত্মসুখের প্রতি যদি অধিক দৃষ্টি পড়ে, তবেই স্বার্থপরতার পাপে পাপী হইলাম।

ভিতরে এত লম্বা লম্বা, দীর্ঘ দীর্ঘ পাপাকৃতি দেখি, ঠিক যেন নরকের কীট কিল্ বিল্ করিতেছে। এখনও জানি, প্রত্যহ এক শত পাপের কম করি না। গণনা যদি করি, এ জীবনে কত পাপ করিয়াছি, এই ৪৪ বৎসরে দশ লক্ষ পাপ করিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে পাপবোধ এত ভয়ানক যে, ছোট ছোট পাপও ধাঁ করিয়া, মন ধরিয়া ফেলে। সেই পাপবোধ কষ্ট দেয়। পরের পাপ গণনা করিবার জন্য যেন কেহ আমার মনকে নিযুক্ত করিয়াছে, মন এমনই সাক্ষ্য দিতেছে। সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত কেবলই পাপ গণনা করিতেছে। এই স্বার্থপরতা হইল, তার পর এই অভিমান হইল, তার পর পরদ্রব্যে আসক্তি হইল, তার পর মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা হইল, তার পর টাকার প্রতি মত্ততা হইল, তার পর অন্য দশ জনের অপেক্ষা নিজের সুখ-চেষ্টা অধিক হইল, এই গণিতে গণিতে সন্ধ্যা হইল, রজনী হইল। শেষ আর হইল না। এই পাপ-গণনা বুদ্ধিগত নয়, হৃদয়ের গণনা। ইহাতে জ্বালা হয়। অন্তরে বুদ্ধি কেবল যে বলে, এত অহঙ্কার ভাল নয়, এত স্বার্থপরতা অন্যায়—তাহা নয়। যুক্তিবাদীদের কথা আমার কাছে দুর্ব্বল। সরল কথা কি? যেমনই পাপবোধ, অমনই কষ্ট, জ্বালা। যেমন মাকড়সার প্রকাণ্ড জালে মাছি কোথাও পড়িলেই, মাকড়সা অনুভব করিয়া অমনই ধরে, তেমনই আত্মিক স্নায়ু বলিয়া যদি পদার্থ থাকে, তাহার জালে পাপ পড়িলেই মন অনুভব করিয়া ধরিতে পারে। জীবনের কোথায়

কি একটা ভাবনা হইতেছে, কোথায় কি একটা কর্ত্তব্য করা হয় নাই, কি করা উচিত ছিল, অথচ অকৃত আছে, কোথায় ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, জীবনের কোন্ স্থানে দুর্ব্বলতা, চৈতন্যশীল মন ধাঁ করিয়া দেখিতে পায়। দেখিয়াই বলে, "কি রে! অন্ধকারে এই সব রহিয়াছে? তবে ত ডাকাত হইতে পারি। দশ হাজার টাকা দেখিয়া লোভ? পরদ্রব্যে এত লালসা?" এই পাপের গণনা আরও কতদূর বিস্তৃত করিতে পারি? গঙ্গার মতন। সমুদ্রের মতন। মহাসমুদ্রের মতন। অধিক কি বলিব, এমন পাপ নাই, যাহা করিতে পারি না। /

যদি অসাধুতার সম্ভাবনা না যায়, তবেই পাপ রহিল। এই জন্য আমি অন্যকে শীঘ্র সাধু মনে করিতে পারি না। আর এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ পাপী বলিয়া লজ্জিত করিতে পারে নাই; কখনও যে পারিবে, তাহার সম্ভাবনাও অল্প। ভিতরে যে পঞ্চাশ হাজার পাপ নিজে গণনা করিল, যে নাম ধরিয়া সেই সকল পাপ বলিতে পারে, তাঁহাকে কিরূপে লজ্জিত করিবে? যে ডাকাতি করিয়া আসিল, তাহাকে একটী পয়সা চুরীর দুর্নাম দিলে কি হইবে? ডাকাতকে একটী পয়সা চুরীর দোষ দাও: সে বলিবে, 'কি সামান্য পাপের কথা বলিল।' যার পাপবোধ জীবনের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে পাপ দেখিতেছে, তাহাকে পাপী বলা কঠোর বা তীক্ষ্ণ দুর্ব্বাক্য নয়। আমাকে যদি পাপী বল, তাহা শিক্ষার জন্য হইতে পারে।

বিবেক আমার বড় শত্রু। ভয়ানক ইহার কাটিবার শক্তি। তীক্ষ্ণরূপে পাপ বুঝিতে পারে; বুঝিয়াই কাটিতে যায়। এই একটী পাপ হইল, অমনই বিবেক তাহাকে ধরিল। কাহারও

উপর দয়া করিতে গিয়া, এক চুল ন্যায় ধর্ম্ম যদি অতিক্রম করি, দিবসে রজনীতে আর শান্তি পাই না। ন্যায়পরতা ষোল আনা লাগিয়া বসিয়া আছে। ভৃত্যকে একদিন যদি বেতন দিতে বিলম্ব হয়, অমনই বিবেক বলে, "ওরে পাপী! অন্যায় ব্যবহার?" যদি বলি, আজ হইল না, কাল দিব, বিবেক বলে, "তুমি আজ খাইলে কিরূপে? আপনি ধনী হইয়া মুখে অন্ন তুলিতেছ, আর গরিব ভৃত্যকে বেতন দাও নাই? কতদূর অন্যায়!" কলিকাতা ছাড়িয়া বেলঘরিয়া যাই, স্থল ছাড়িয়া নৌকায় বেড়াই, বিবেক কিছুতেই ছাড়ে না। জবাব দিতে হইবে, জবাব দিতে পারি না। ছোট আদালত হৃদয়ের মধ্যে খোলাই রহিয়াছে।

পাপের জন্য আমি গুরুভারাক্রান্ত। তোমরা বলিতে পার, এত পাপ কর? নববিধানবাদী হইয়াও হৃদয়ের ভিতরে এত পাপ? দেখ, এই লোককে তোমরা শ্রদ্ধা কর। ইহা তোমরা দেখ না, জান না। এই ত জ্বালা ও কষ্ট। ধন্য ঈশ্বরকে, যে পৃথিবীর মধ্যে এমন সুখীও অল্প দেখিতে পাই। নরকের কীট ত কিল্ বিল করিতেছে, রসনায় পাপ, কাণে পাপ, চক্ষে পাপ দেখিতেছি, কিন্তু হইতেছে কি? হইতেছে উপকার। পাপবোধ যদি না হইত, এখানে থাকিতাম না, এখানে আসিতে পারিতাম না। আমার জাগ্রত নরক, জাগ্রত স্বর্গের কারণ। অসুস্থ শরীরে কোথায় কি রোগ, কোথায় কি বেদনা, জ্বালা, সহজে অনুভব হয় না, সহজে ব্যাধি জানা যায় না; কিন্তু সুস্থ শরীরে কোথাও কিছু হইলেই তৎক্ষণাৎ অনুভব হয়। ইহা মঙ্গলেরই চিহ্ন। কেন না, এই অনুভব হইবা মাত্রই প্রার্থনা হয়, যোগ করিবার ইচ্ছা হয়। কেবল দশটী

যদি পাপের সম্ভাবনা থাকিত, দশটী যদি পাপের কারণ থাকত, সেই গুলি অতিক্রম করিলেই আমার ন্যায় জগতে। সাধু নাই ভাবিতাম। মনে করিতাম, আমি সাধু হইয়াছি। আমার সমস্ত শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রতি মাসে, প্রতি দিনে বিবেক আমার উন্নতির নূতন পথ দেখাইয়া দেয়; কেবলই পাপবোধ উৎপন্ন করিয়া দেয়। শরীরের জ্বালায় কোন লোক যদি কেবল গোলদীঘী হইতে লালদীঘী, লালদীঘা হইতে গোলদীঘী ছুটিতে থাকে, তাহাতে তার যে অবস্থা, এ লোকের অবস্থাও সেইরূপ। রোজ রোজ জ্বালায় এইরূপ ছট্‌ফট্ করিতে হয়। একে পাপ, তার উপর আবার অবিশ্বাস। ভগবান্ কি এখানে? ঈশা কি আছেন? চৈতন্যের মুখ কি দেখিতে পাইব? যাই এ কথা মনে হইল, অমনই কে বলিল, "অরে অপরাধি! চৈতন্যের মুখ দেখিবি না? যিনি নাচিতেছেন গৌরাঙ্গ হইয়া, তাঁহাকে দেখিবি না? ঈশা নাই?" দোষীর তাহাতেই কষ্ট হইতে লাগিল। ঈশ্বর ছাড়িলেন না। এ সহর হইতে ও সহর, ও সহর হইতে এ সহর, দেখিতে দেখিতে শান্তিপুরে গিয়া শান্তি-ঘরে শান্ত হইলাম। বলিলাম, জ্বালার শান্তি হইল। রোগী না হইলে কি সুস্থতার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে? দুঃখী না হইলে ধনলাভের যে কি সুখ, তাহা কি কেহ জানিতে পারে? কি সুখ যে হয় জ্বালা নিবৃত্ত হইলে, তাহা আমি দেখিলাম।

ঘড়ির কাঁটা বারবার বাজে, আর বারবার কে বলে, "তোর কিছু হয় নাই, তোর কিছু হয় নাই, কিছুমাত্র হয় নাই।" ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে তেমনই এই ভিতরের কথা আমাকে চাবুক মারিতে থাকে। আশ্চর্য্য এই, আমি কাঁদি, আবার হাসি। যত

কাঁদি, তত হাসি। খুব কাঁদি, খুব হাসি। ঔষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে ঔষধ কে না খায়? এই জন্যই আমি বন্ধুদিগকে কেবল বলি, ওগো তুমি পাপী, তুমি পাপী, তুমি অলস, তুমি অপরাধী। কিন্তু আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করে না। তোমরা কি জাননা যে, তোমরা পাপী? আমি বলি, ভয়ানক পাপ; তোমরা বল, পাপ। আমি বলি, মহাপাপ: তোমরা বল, দোষ। আমি বলি, দোষ; তোমরা বল, অযৌক্তিক কার্য্য। আমি মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে, পাপের জ্বালা নাই। যার জ্বালা আছে, তার নিরুত্তর ভাব হইতে পারে না। সে নিশ্চেষ্ট থাকিবে কিরূপে? তোমাদের মনে হয়, পাপী ছিলাম, পাপী নাই, এখন সাধু হইয়াছি। নববিধানের দিকে দৃষ্টি নাই। যেমন খৃষ্টবাদীর কাছে, বুদ্ধবাদীর কাছে, অনেকের কাছে পরিত্রাণ, তাহাই হইতেছে। আমি দেখিতেছি, হরিপদে আমার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হইল না। ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ পাপী এই পাতকী, এই বেদী স্থিত ব্যক্তি। অলঙ্কার নয়, পদ্য নয়, যথার্থ কথা। নিজের মন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীতে অল্প অপরাধী আছে এমন।

আমার কেবলই পাপ। অন্যের যাহা পাপ, আমার নিকট তাহা পাঁচটা পাপ। অন্যের কাছে যাহা পাপ নয়, আমার কাছে তাহা পাপ। অন্যে বিচারিত হইবে যদ্দ্বারা, আমার বিচার তদ্দ্বারা নয়। এই জন্য বিচারপতির কথা মনে হইলে, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে। যদি কথা একটু মিষ্ট না হয়, অমনই হৃদয়ের ভিতরে বিচারপতি বলেন, তোর কথা কেন মিষ্ট হইল না? কেন সকলকে অমৃত কথা বলিলি না? যদি কোন কথা

একটু মিষ্টতাশূন্য বলিয়া থাকি, অমনই কষ্ট হইতে থাকে। রাত্রিতে কষ্ট হয়, দুই, পাঁচ, দশ দিন ধরিয়া কষ্ট হয়। কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য ত অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্যও অনুরুদ্ধ। একটু যদি কাহার উপর অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া থাকি, অমনই কষ্ট আরম্ভ হয়। নয়নের উপর একটু তাকাইয়াছি বলিয়াও দোষ? নববিধানবাদীর ইহা ভয়ানক দোষ। নববিধানে যাহারা উচ্চপদধারী, তাহাদিগকে বলি যে, তোমরা দোষ খণ্ডন করিয়া লও। তুমি বল, ব্যভিচার পাপ; কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি একটু আসক্তি দেখায়, অধিক স্ত্রীজাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি বলি, কি ভয়ানক! তুমি বল, চুরী পাপ; আমি বলি, এ ত মুসার সময়ের কথা। তুমি অধিক টাকা কড়ির বিষয় ভাব? কি ভয়ানক! তুমি এখনও কাজ কর? এ যে ভয়ানক ভাবনা, তুমি এই ভাবিতেছ? ধ্যানের সময় পাঁচ মিনিটের মধ্যেও, সময় চুরী করিয়া, তুমি ভাবিতেছ—ছেলে কি খাবে? টাকা কিরূপে হবে? ব্যাকুল হইতেছ? কন্যাকার জন্য চিন্তা করিতেছ? পাপের বোধ আমাদিগের মধ্যে খুব বর্দ্ধিত হউক। পাপ অপেক্ষা পুণ্য যে উৎকৃষ্ট বস্তু, ইহা ত জান। পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জ্বালা হয়, তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে, তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। হাতে যদি কুইনাইন থাকে, ঔষধ থাকে, জ্বর হয় হউক। পাপের বোধে যদি কষ্ট হয়, তাহাই সুখের কারণ হইবে। তখন কি কষ্ট, যখন যোগেশ্বরকে জানি, যোগানন্দ জানি? দুঃখে আর কি ভয়, যখন সুখ পাইব? এই জন্য হরি বড়, কি যম বড়, একথা আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। লক্ষ পাপ হাতে, কোটী

ঔষধও হাতে। লক্ষ লক্ষ শয়তানকে এখনই নষ্ট করিব। যে মাকে প্রাণ দিয়াছে, সে কি পাপকে ভয় করে? শয়তানের বল কৈ? বন্ধু, যেমন অন্ধকারের কথা বলিলাম, তেমনই আলোকের কথাও বলিলাম। যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করুক; যেমনই ছট্‌ফট্ করিবে, অমনই শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তি দান করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা।

রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ৬ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

জীবন-ভাগবতের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্ম্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিমন্ত্রে। বাল্যকালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা জ্ঞান করি। অগ্নিমন্ত্র কি? শীতলতা কি বুঝিতে হইলে, উত্তাপ বুঝিতে হয়। শৈত্যমন্ত্র জানিতে হইলে, অগ্নিমন্ত্র জানিতে হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক জীবনে শীতলতা থাকে, অগ্নি থাকে না; অনেক জীবনে অগ্নি থাকে, শীতলতা থাকে না। অনেকের শীতল স্বভাব; মনের ভিতরে শান্তি; তাঁহারা কার্য্যবিহীন, তাঁহাদের কার্য্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাব। গতি মৃদু, কথা আগ্রহবিহীন, হৃদয়ে তেজ অল্প, চক্ষু কোমল, এই সকল ব্যাপার দেখিলে, শৈত্যপ্রধান জীবন নির্দ্ধারণ করি। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা শীতলতা ব্রত বলিয়া সাধন করেন; তাঁহারা চলেন শীতল ভাবে, কার্য্য করেন শীতল ভাবে; সাধন যদি শেষ করিতে হয়, শেষ করেন শীতল ভাবে। তাঁহারা শীতল প্রদেশেরই অন্বেষণ করেন; বাস করেন শীতল প্রদেশ লইয়া। তাঁহারা শীতল যোগ সাধন করিতে চান; শীতল মুক্তি পাইবার অভিলাষী হন। স্বর্গে গিয়া সেখানেও শীতল স্থানে শীতল ভাবে থাকিবার আশা করেন।

যদি পৃথিবীতে তাঁহাদের সম্মুখে অগ্নি ও জল স্থাপন করা হয়, তাঁহারা অগ্নি ছাড়িয়া জলে প্রবেশ করেন। স্বর্গীয় অগ্নি ও জল যদি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়, আশা ও ভক্তির সহিত তাঁহারা জলের দিকে দৃষ্টি করেন। কবে সেই জল পাইবেন, কেবল এই আশা করেন।

শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মনুষ্যের স্বভাবকে; শিথিল করে স্বভাবের বন্ধনকে। তেজ যদি থাকে, তাহা নিস্তেজ হয়; শক্তি সংকীর্ণ হয়; বীর্য্য উদ্যম অবসন্ন হইয়া পড়ে। জল আসিয়া সমস্ত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, ভীরুতা আসিয়া সাহসকে গ্রাস করে; সংকীর্ণতা, দৈন্য আসিয়া উদ্যম উৎসাহ বলিয়া যা কিছু উত্তেজক ভাব আছে, এক এক করিয়া সমুদয়কে নির্ব্বাসিত করে। ধর্ম্মক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী হইবার উদ্যোগ করে তাহারা, যাহারা শীতলতা ভিন্ন আর কিছুই চায় না। নিষ্ক্রিয় উপাসনা ও বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়া শৈত্যপ্রধান জীবন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতে থাকে। দুঃখ যে দিকে, সে দিকে তাহারা যাইবে না; যেখানে শান্তি, নির্ভয়, সেইখানে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে। এ সমুদয়ের বিপরীত দিকে যা কিছু দেখিতে পাও, তৎসমুদয় অগ্নি। এই সকলের বিপরীত ভাব অগ্নিপ্রধান জীবনে দেখিতে পাইবে। এই ব্যক্তির জীবনে, গোড়া হইতে এ পর্য্যন্ত, এই উৎসাহ উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে। ইহা যে সাময়িক বীরত্বের ভাবে দেখা দিতেছে, তাহা নয়। কথনও কথনও দেখা যাইতেছে, তা নয়। ধর্ম্মের অভিধানে লেখা আছে, উত্তাপের অর্থই জীবন; উত্তাপের বিপরীত মৃত্যু। শরীর যদি সম্পূর্ণরূপ শীতল হইয়া পড়ে, চিকিৎসকেরা

সিদ্ধান্ত করিবেন, মৃত্যু। কিছুমাত্র অগ্নি নাই, একটুও উত্তাপ নাই, দেখিলেই বলিবেন, প্রাণ-অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। ধর্ম্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু। এই জন্যই বাল্যকাল হইতে আমি অগ্নির পক্ষপাতী; অগ্নিমন্ত্রেই আমার দীক্ষা। একটু ঠাণ্ডাভাব দেখিলেই মন দুড়্ দুড়্ করে!

শরীরে হাত দিলেই ভিতরে জীবন কি মৃত্যু বুঝা যায়; আত্মাকেও দেখিবা মাত্র তেমনই জীবিত কি মৃত, জানিতে পারা যায়। আমি পাপী কি না বুঝিতে বরং সময় লাগে, কিন্তু জীবন আছে কি না, অতি সহজেই জানা যায়। কিসে? উত্তপ্ত, কি শীতল, দেখিলেই ইহা নির্দ্ধারণ করা যায়। এই কারণেই, প্রার্থনা করি, সাধন করি, কিসে আত্মা উত্তাপযুক্ত, সতেজ থাকে। অগ্নির ভিতরে জীবন থাকে বলিয়াই অগ্নিকে আমি বরণ করি, আলিঙ্গন করি ও অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকি। উত্তাপ দেখিলেই ভরসা হয়, আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়। যদি দেখি, অগ্নির তেজ কমিতেছে, বুঝি, এবার এ লোক জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। যদি দেখি, পাঁচ বৎসরের উৎসাহের পর কেহ ঠাণ্ডা হইতেছে, বুঝিয়া লই, এ লোক এবার পাপ করিতে চলিল, এবার মৃত্যু আসিয়া ইহার ঘাড় ধরিবে। এই জন্যই উত্তাপবিহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যে দিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতল ভাব, আমি একই মনে করিতাম। কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। এক দলের কাছে সেবা করিলাম, আর একটী দল কবে হইবে; দশটী দল প্রস্তুত করিলাম,

আর দশটী দল কবে প্রস্তুত করিব, ইহারই জন্য ব্যগ্র থাকিতাম। এক বিভাগে কাজ করিলাম, আর এক বিভাগে কবে কাজ করিব; কতকগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কিসে আলাপ করিতে পাইব; কতকগুলি শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া সত্য সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্যগুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এই জন্য কিরূপে অপর কতকগুলি খুঁজিয়া সত্য সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন দিকেই দৌড়িতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপবিশিষ্ট; পুরাতনের অর্থই শীতল। কত লক্ষ-পরায়ণ ব্রাহ্ম দেখিলাম; চাকরী পুরাতন হইল, পাঠ অধ্যয়ন পুরাতন হইল, বড় বড় সুবার মৃত্যু হইল। কত উৎসাহী পুরুষ ছিলেন, পাপ করিলেন না, নরহত্যা করিলেন না, অবশেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন। কত ব্রাহ্ম অনেক দিন বৈরাগ্য সাধন করিলেন, অবশেষে তাঁহাদের জীবন যাই শীতল হইয়া আসিল, সংসার তাঁহাদের নিকট হইতে সুদ শুদ্ধ আসক্তি আদায় করিল; টাকার লোভে শেষটা মারিতে হইল। অনেক উৎসাহী যুবা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা এ বিভাগে কি ও বিভাগে, এ দলে কি ও দলে, এ গ্রামে কি ও গ্রামে, কোথায় যে লুকাইয়া রহিলেন, দেখা যায় না। এক সময়ে কেমন উৎসাহী বীরের ন্যায় ছিলেন, এখন এমন ঠাণ্ডা যে কাছে বসিলেও উত্তাপ বোধ হয় না। এমনই ঠাণ্ডা যে, আপনারা কেবল মরিতেছেন তাহা নয়, তাঁহাদের জীবন হইতে অপরের জীবনে জল প্রবিষ্ট হইতেছে। কত লোকেই তাহাতে মরিতেছে। পাছে হস্ত পদ শীতল হয়, পাছে

চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, পাছে হৃদয় উদ্যমবিহীন হয়, ইহার জন্য আমি সর্ব্বদা সাবধান। একটু ঠাণ্ডা ভাব, পুরাতন ভাব দেখিলাম, মনে হইল, করি কি? কাজ কর্ম্ম যে পুরাতন হইতেছে, উপাসনা যে পুরাতন হইতেছে, বলিলাম, "দয়াময়, এ বিপদ হইতে সন্তানকে বাঁচাও।" এই বলিবা মাত্র হোমের আয়োজন করিলাম, ঘি ঢালিতে লাগিলাম। ঈশ্বর যিনি অগ্নিস্বরূপ, তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দেখি, সমুদ্র, নদীর উপরে আগুন ভাসিতেছে; পর্ব্বতে আগুন জ্বলিতেছে; জীব-শরীরে পর্য্যন্ত আগুন রহিয়াছে। নব নব সত্য অমনই এদিক হইতে, ওদিক হইতে প্রকাশিত হইল।

যদি মিথ্যা কথা কই, তাহ'লেই কি পাপী? তা নয়। যদি উপাসনাতে ঠাণ্ডা ভাব হয়, যদি আমার কথায় শ্রোতারা ভীরু হয়, উৎসাহহীন হয়, তাহা হইলেও আমি ঘোর পাপী। কেন না, পৃথিবীতে ঠাণ্ডা বিষ ঢালিতে আমি আসি নাই। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট যদি হই, কেবল আমার সর্ব্বনাশ হইবে না, আর দশ জনের সর্ব্বনাশ হইবে। সর্ব্বদা উত্তাপ না থাকিলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এই জন্য আশাগুলিকে সতেজ করিয়া, বিশ্বাসকে সতেজ করিয়া, সতেজ উদ্যম লইয়া থাকিব। যখনই মনে হইবে শীতল ভাব আসিতেছে, বুঝিব, কাম, ধূর্ত্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। মনে করিব, পাপের শয্যায় শয়ন করিয়াছি। উপাসনার ঘরে গিয়া যদি দেখি, কেবল জল, বুঝিব, অদ্যকার উপাসনা মারিল। ধ্যান করিতে ইচ্ছা নাই; শব্দ এক একটী বলিতেছি, মনের ভিতর দেখিতেছি, তেজের সহিত বলিতেছি না; বুঝিব, উত্তাপ নাই, মৃত্যুর ব্যাপার। কার্য্যালয়ে বসিয়া কার্য্য

করিতেছি, অথচ উত্তাপ নাই ; বুঝিতে হইবে, প্রভুর কার্য্য করিতেছি না, মরণের কার্য্য করিতেছি। সেই জন্যই আমি প্রথম হইতে অগ্নিমন্ত্রের আদর করিতেছি। বিশ্বাসী দলের মধ্যে শান্তভাব আছে, জানি। কিন্তু দোষ হউক, আর গুণ হউক, আমি চিরদিনই উত্তাপপ্রিয়। নিষ্ক্রিয় হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে ; দল ছাড়িয়া এক স্থানে লুকাইয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব। অগ্নিতে মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়াছি। এই ভাব লইয়া সেবা করিলাম, পরিশ্রম করিলাম, ধ্যান, সাধন করিলাম, নির্জ্জনে ব্রহ্মদর্শন কেমন তাহাও অনুভব করিলাম, সমুদয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম ; কিন্তু শীতলতার কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইলাম না, এই সৌভাগ্য মনে মনে বোধ করিতেছি।

শীতল যাহারা, তাহারা ভীরু হয়, পাঁচ দশ বৎসর সাধন করিয়া পলায়ন করে। শীতলতা এমনই যে, অগ্নিকে একেবারে নিবাইয়া ফেলে। গরম, কি নরম ? দেখিবে, ক্রিয়া আছে কি না ? উদ্যম আছে কি না ? যদি দেখ, আর বড় চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয় না, আর কার্য্য করিতে কোন আমোদ হয় না, আর দশ জনে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে উৎসাহ হয় না, অমনই চিকিৎসক ডাক, তোমরা মরিতে বসিয়াছ। তোমরা ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদের ধ্যানে উদ্যম উৎসাহ থাকিবে না ? ধর্ম্ম কার্য্যে উত্তাপ থাকিবে না ? কখনই ইহা হইবে না। নিরাশার ঠাণ্ডা কথা তোমরা মুখে এনো না। হাত পা যেমন গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কার্য্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত, এ সমুদয়ে উত্তাপ থাকিলে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ

পাইবে। তোমার অঙ্গুলিতে এমনই উত্তাপ থাকিবে যে, স্পর্শমাত্র তোমার অঙ্গুলি হইতে আমার অঙ্গুলিতে তাপ সঞ্চালিত হইয়া আসিবে। আশীবৎসরের বৃদ্ধের এমনই তেজ যে, রসনা হইতে কথা বাহির হইতেছে, অমনই লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইতেছে। কাছে আসিলেই লোকে বলিবে, আশী বৎসর বয়স হইল, উৎসাহ এখনও কমিল না? এইরূপ তেজ, উৎসাহ, উত্তাপ, অগ্নি, প্রত্যেকের রাখিতে হইবে। উৎসাহদাতা প্রাণদাতা যিনি, তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।

হে দয়াসিন্ধু! হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম! এই পৃথিবীতে সংসার অনেক কূপ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই মানুষকে ধরিয়া নিক্ষেপ করে, বিনাশ করে। জননি! যতক্ষণ উত্তাপ থাকে আত্মাতে, ততক্ষণ আমরা তোমার। সংসার যদি কূপের জলে ফেলিয়া দেয়, আর উত্তাপ থাকে না, আর ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি না, শৈত্য আসিয়া নষ্ট করিতে থাকে। হে প্রেমময়! আরও বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় তেজ দাও, যেন অকালে শীতলতারূপ মৃত্যুগ্রাসে না পড়ি। এই পরম সৌভাগ্য যে, মা বলিয়া এখনও ডাকিতেছি; এখনও দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই বাল্যকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া, রোগ, সন্তাপ, বিপদ, আপদের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ পূজা করিতেছি; এখনও বন্ধু বান্ধব লইয়া নাচিতেছি, তোমার নামের গীত গান করিতেছি। কত লোক আসিয়াছিলেন, কত ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই পলায়ন করিলেন। অগ্নিমন্ত্রে যদি আমায় দীক্ষিত না করিতে, তোমাকে

পুরাতন বলিতাম, নববিধান বলিতাম না। তুমি উৎসাহ দিয়া বাঁচাইলে। দেখিলে যখন সব পুরাতন হইয়া আসিতেছে, তখন প্রকাণ্ড নববিধানকে পাঠাইয়া দিলে। নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছিল যখন সমস্ত দীপালোক, তখন প্রকাণ্ড গ্যাসের আলো জ্বালিলে। ধন্য, ধন্য তুমি, বলিয়া উঠিল সমস্ত সাধকগণ। তাহারা আর এক শত বৎসর অধিক আয়ু লাভ করিল, সমস্ত নিরাশা ভয় চলিয়া গেল। একটা বাদ্যের পরিবর্ত্তে এক শত বাদ্য স্থাপন করিয়া, বিধানের শ্রীহরি, তোমার নাম গান করিতে লাগিলাম। এই দেশের পথ ঘাট শান্ত হইয়া আসিতেছিল, যুবকসম্প্রদায় নিস্তেজ, নিরুদ্যম ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, কত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগ্নী উৎসাহহারা হইয়া ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া সংসারে ঢুকিতেছিলেন, হে করুণাসিন্ধু উৎসাহদাতা! তোমার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার মানস করিয়া, সকল চরবস্থার মধ্যে তুমি পথ ঘাট সমস্ত অগ্নিময় করিয়া দিলে। নিস্তব্ধ রসনাকে এমনই উত্তেজিত করিলে যে, সেই অবসন্ন রসনা আগুনের মত কথা কহিতে লাগিল। বৃক্ষ লতায় আবার তোমায় দেখিলাম, সংসারে আবার তোমায় দেখিলাম, জলের মধ্যে পুনরায় তোমাকে দর্শন করিলাম, আর আগুনের ভিতর ত কথাই নাই। গেলাম গেলাম করিয়া আবার বাঁচিলাম। পুরাতন হইতে তুমি দিলে না। নবীন উদ্যম উত্তাপ পাইয়া রহিয়া গেলাম। পাপ না করিলেও মরিতাম; নিতান্ত মিথ্যাবাদী শঠ না হইলেও কেবল সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতাম। আজও সেখানে নগর-কীর্ত্তন হইতেছে, কি প্রমত্ত বৈরাগীদের মত্ততাই দেখিতেছি! ধন্য, ধন্য তুমি! এমনই চির-নবীন ধর্ম্ম দিয়াছ যে, কাহারও উৎসাহ আর কমিতে চায় না। আর যে কেহ কোন

কালে ইহা লইয়া বলহীন উৎসাহহীন হইয়া মরিতে পারে, একথা বিশ্বাস করি না। নববিধানে মরণ ত নাই; শীতলতা একেবারে নাই। আমার গুণে নয়, ভাইদের গুণে নয়, তোমার গুণে। উৎসাহ আর কমিবে না; এমন নৃত্য করিব যে আর থামে না। যে মা বলিয়া ডাকিতেছি, এ মা বলা আর শেষ হইবে না। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবিয়া যায়, মনের আগুন ত কোন মতেই নিবিবে না। যদি ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর মন পূর্ণ করিতে পারে, দেখিবে, এ অগ্নি নিবিবার নয়। কি অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। এ আগুনে ত কেউ মরিবে না। এই অগ্নি লইয়াই থাকি। এই সুখেই জীবন কাটাই, আশীর্ব্বাদ কর। অক্ষয় ব্রত দাও, অক্ষয় উৎসাহ দাও, যাহা কোন ক্রমেই নির্ব্বাণ হয় না। অগ্নির ভাবে উৎসাহিত কর, সেই ভাবে নৃত্য যেন করি। যে নৃত্য থামে না, সেই নৃত্যে নাচাও। যে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না, সেই অগ্নি জ্বাল। তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, দয়াময়, আমাদিগকে এ ভিক্ষা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়।

অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য।

রবিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ১৩ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, অরণ্যবাস এবং বৈরাগ্য। সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু, তাহাই ঘটিল। যিনি আমার চরিত্র ছবি আঁকিলেন, সেই স্বর্গীয় সুনিপুণ চিত্রকর প্রথমতঃ ঘোর কাল রং দিয়া চারিদিক ঘোরতর কাল করিলেন, খুব কাল রং হইল, তাহার উপর নানা প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের ছবি আঁকিতে লাগিলেন; আজও সেইরূপে আঁকিতেছেন। কাল ভূমির উপর ছবির শোভা প্রকাশ পাইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্য আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। বিধাতা জানেন, প্রথম হইতেই বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরেই মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতি দিল? কে বলিল, আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাঁহাকেই মানিতাম; তাঁহাকে বিবেক বলিতাম। সেই বিবেক একটী বাণী বালককে বলিলেন, বালক পরিত্যাগ করিল। চতুর্দ্দশ বৎসরেই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল। যখন ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের পদতলে আশ্রয় পাইলাম, ধর্ম্মোত্তাপ উদ্দীপ্ত হইয়া আসিল, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তখন পূর্ব্বকার

মেঘ, যাহা অঙ্গুলির মত জীবনাকাশে দেখা দিয়াছিল, যাহা কেবল মৎস্য-বর্জ্জনেই পরিব্যাপ্ত ও পরিসমাপ্ত ছিল, সেই মেঘ ঘনীভূত হইল। এত ঘনীভূত হইল যে, মুখ মলিন হইয়া পড়িল, হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল; এমনই হইল যে, দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না।

যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। আমোদকে বলিলাম, "তুই শয়তান, তুই পাপ।" বিলাসকে বলিলাম, "তুই নরক; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" শরীরকে বলিলাম, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।" তখন ধর্ম্ম জানিতাম না; জানিতাম, সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। পৃথিবীতে যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের বিষয় মনে হইল। সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল, "ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না কলঙ্ক, পাপ, এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়্, আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।" সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল; যাই সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম, যেন নরকের দূত আসিল। সংসারের রূপকে ভীষণ দেখিতাম; স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ, তাহাকে ভয় হইত। সংসারকে ঠিক বিষপাত্র বোধ হইত। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, ভিতরে ভয়ানক। সর্ব্বদা ভয় হইত, আশঙ্কা হইত; যেখানে পা পড়িবে, সেইখানেই কাঁটা আছে, দানব আছে, ভয়ানক জ্বররোগ লুক্কায়িত আছে, এই মনে হইত। সহাস্য বদন বিমর্ষ হইল। মন বলিল, তুমি যদি হাস, পাপী হইবে: হাসিলো

পাপ হইবে। হাস্য আমার নিকট হইতে বিদায় লইল। বন্ধুরা কেহ কেহ দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। যাহাতে হাস্য হয়, তাহা চাহিব না; যে পুস্তক পড়িলে, কি যে বন্ধুর কাছে গেলে, হাস্যের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা, সে পুস্তক, সে বন্ধু হইতে দূরে থাকিব, হৃদয়ের এই সঙ্কল্প হইল।

ক্রমে মৌনী হইলাম, অল্পভাষী হইলাম। সুখ সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। বন ছিল না, বনে গেলাম না। গৈরিক বস্ত্রের ভাব ছিল না, তাহাও পরিলাম না। কোন প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিতে অস্বাভাবিক উপায়ও অবলম্বন করিলাম না; করিবার ইচ্ছাও হয় নাই। কোন প্রকার বাহ্য লক্ষণের কথা মনেও হয় নাই। যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীকে, যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরকে শ্মশানের মত, বনের মত করিলাম। বাড়ীর লোকদিগের কোলাহলকেই মনে করিলাম, যেন বাঘ ডাকিতেছে। যেখানে মন্দ আচার ব্যবহার দেখিতাম, মনে করিতাম, সেইখানেই মৃত্যু লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। আমার বন—সত্য বন ছিল না বটে, কিন্তু সংসারই আমার বন হইল। সংসারের টাকা কড়ির মধ্যে থাকিয়াও আমি সামান্য বস্ত্র পরিয়াই সময় কাটাইতাম। কাঁদিতাম না, কিন্তু হাস্যবিহীন মুখে অবস্থান করিতাম। এই ভাবে সকালে শয্যা হইতে উঠিতাম, এই ভাবে রাত্রিতে শয্যায় গমন করিতাম। সূর্য্য হাসাইতে পারিত না, চন্দ্রও হাসাইতে পারিত না। তখনকার প্রধান বন্ধু কে জান? ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে যিনি এই ভাব ভাল চিত্র করিতে পারিতেন, তিনি। তাঁহারই "রাত্রিচিন্তা" পাঠ করিতাম। কোন আমোদ যদি তখন পাইয়া থাকি, তাহা সেই পুস্তক পড়িয়াই পাইয়াছি।

হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক, কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতেই হইবে। দ্বিজ হইতে যদি চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্ততঃ কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে ;—এই যে উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুগণ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড় মড় করিয়া তোমার হৃদয়ের হাড় ভাঙ্গিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে গিয়া ফিরিয়া এস।

যদি কেবল সামান্য কার্য্য করিতে চাও, তাহা হইলে তদনুযায়ী হিন্দুর মতন, মুসলমানের মতন, খ্রীষ্টবাদীর মতন কয়েকদিন বৈরাগ্য সাধন কর। কষ্ট সহ্য না করিয়া, বৈরাগ্য সাধন না করিয়া সংসারে যাইও না। গিয়াছ কি সংসারে ? যদি গিয়া থাক, দ্বিতীয় বার সংসার করিবার সময় বৈরাগ্য গ্রহণ করিও। ইহলোকে যদি না কর, পরলোকে করিতে হইবে। একবার না কাঁদিলে যথার্থ হাসি হইতে পারে না। অমাবস্যার অন্ধকারে না পড়িলে পূর্ণিমার আলোক ও শোভা বুঝিবে না। ধন্য দয়াময়! এ জীবন-উদ্যানে এখন ভক্তির আনন্দ-ফুল ফুটিয়াছে। এ জীবনে দুঃখ কষ্ট হইতে বুঝিয়াছি, শোকে মুহ্যমান হওয়া উচিত নয়। "সুখ আসিতেছে," এই সংবাদের দূত হইয়া বিষাদ সমাগত হয়। সুখ হইবে বলিয়া

বৈরাগ্য স্বাভাবিক মর্কট বৈরাগ্য আমি চাই না; যে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়াসী নই। আমি শরীরে ভস্ম লেপন করিয়া বৈরাগ্য সাধন করি নাই; সহজে যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই করিয়াছিলাম। সহজ স্বাভাবিক বৈরাগ্যই আমি অবলম্বন করি। সেই বৈরাগ্য হইতেই আমার মঙ্গল হয়। কাল রঙের মেঘোদয় হইলেই জানা যায়, বৃষ্টি বর্ষণ হইবে। জীবনে বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিলেই, এই বিজ্ঞানসঙ্গত সত্যের পরিচয় পাই, হয় একটী নববিধান আসিবে, হয় একটী নবতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, না হয় একটী নব সাধনপ্রণালী আবিষ্কৃত হইবে। যখন এইরূপ হয়, তখনই বৈরাগ্যের ভাব হৃদয়কে অগ্রে অধিকার করে। এই যে প্রসববেদনা হয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, একটী সুসন্তান হইবেই হইবে।

আদেশ হইল, নিজে রন্ধন কর, কি বিনামা পরিত্যাগ কর, অথবা দুই দিনের জন্য কোন বিশেষ স্থানে বাস কর, এ সকল শরীর দগ্ধ করিবার জন্য নয়; শরীর দগ্ধ করিলে উপকার কি? প্রকৃত বৈরাগ্য কি? যেখানে বৃষ্টি নাই, সেখানে বৈরাগ্যের মেঘও নাই। লোক দেখাইবার জন্য যে বৈরাগ্য, তাহা পরিত্যাগ কর। ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া বাহিরে সমস্ত বজায় রাখিলে সভ্যেরা যদি বলেন, ইহাতে কপটতা হইল, জন্মসন্ন্যাসী যাহারা আমার ন্যায়, তাহারা ইহাতে প্রশ্রয় দেয়। ঈশ্বরাদেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ ভদ্রতার অনুরোধে আমি ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছি। মন বৈরাগীদের সঙ্গে এক গোত্রের হইয়া গিয়াছে। সেই বংশের পিতা পিতামহ আমি পাইয়াছি। আমাদের মধ্যে যে বৈরাগ্য, সে কষ্টের জন্য

নয়, তাহা আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। যেটুকু ভদ্র ভাব, বাহ্য শোভা রহিয়াছে, এইটুকুই ভদ্রতার অনুরোধে, ব্রতের অনুরোধে রক্ষিত হইয়াছে। নববিধানের আদেশে মন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিয়াছে। বাহিরে ব্যাঘ্রচর্ম্মের প্রয়োজন হয় নাই; বাহিরে না করিলেই ভাল হয়। হৃদয় যেন, হে ভ্রাতৃগণ, বৈরাগ্যকে ধারণ করে। ধর্ম্মের জন্য বৈরাগ্যকে খুব আদর করিবে। এই ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য দ্বারা অনেকে উপকৃত হইয়াছে। নববিধানে বৈরাগ্যের অনেক সাধন প্রকাশিত ও অবলম্বিত হইয়াছে। এই বৈরাগ্যে আত্মা নবজীবনের শোভা ধারণ করে। কষ্ট যদি প্রথমে হয়, সুখ হইলে আর কমিবে না। আজ যত কাঁদিলাম, দেখিব, কাল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ হইয়াছে। অগ্রে ম্লানমুখ হইলে, শেষে হাস্য আসিয়া বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিবেই করিবে।

হে দীনবন্ধু, কাঙ্গালশরণ, যার সম্বন্ধে যে বিধি করিয়াছ, তাহাকে সেই বিধিই ধরিতে হইবে। এই সংসার আরম্ভ সময়ে বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, তখনই বুঝিলাম, এ জীবন হাসিবার জন্য নয়; সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু তুমি নিগ্রহ করিলে না, নিগ্রহের জন্য ভাঙ্গা যষ্টিকে ভাঙ্গিলে না; রুগ্ন শরীর মনকে মারিয়া ফেলিলে না। তিক্ত ঔষধ খাওয়াও, কেবল বাঁচাইবারই জন্য। মেঘ উঠে, আকাশকে চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার জন্য নয়। বৈরাগ্যের অন্ধকারের পরই আকাশ নৃত্য করিতে থাকে, পৃথিবীও নাচিতে থাকে; শস্য ফল ফুলে মেদিনী পূর্ণ হয়। দেখিয়াছি, এ জীবনে যখন যখন মন ভার হয়, অমনই সুফল ফলিতে থাকে। রাত্রির অন্ধকার সকালের দূত হইয়া আসে। গরিবের ঈশ্বর, যা

কর তুমি, সেই মঙ্গল বিধি। এত দুঃখ কষ্ট কিছুই ত স্থায়ী হইল না, বিমর্ষতা ত রহিল না; দিন দিন সুস্থতা, পুণ্য ও ধর্ম্মের আস্বাদন বুঝিতেছি। দর্শনের আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এ জীবনে যেন, নাথ, বৈরাগ্যের কষ্ট লইতে কখনও কুণ্ঠিত না হই। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহাতে ইন্দ্রিয় দমন হয়, হৃদয় ব্রতধারী হয়, জীবন ভাল হয়। এস, দীননাথ, বৈরাগীদিগের মধ্যে প্রধান বৈরাগী, তুমি আপনিই সর্ব্বত্যাগী; আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী হইয়া বৈরাগি-প্রধান যিনি, তাঁহার অনুসরণ করিব। বৈরাগ্যকে দুঃখের জন্য আর কিরূপে বলিব? যত বৈরাগ্য দিয়াছিলে, ততই এখন নৃত্যের আধিক্য দিয়াছ। যত আগে কাঁদিয়াছিলাম, ততই আজ বন্ধুদের গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতেছি, আনন্দ করিতেছি। স্ত্রী পুত্রকে আগে ভয়ানক ভাবিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে চারিধারে বসাইয়া তোমার আনন্দে কত আনন্দ করিতেছি। মনে হয়, এই ত পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতেছি। এই যে সংসার, ইহা ত সংসার নয়। সংসারে প্রবেশ করিতে হইল না। আগে একা মনের বিষাদে বসিয়া থাকিতাম, তাই আজ ব্রহ্মমন্দির বন্ধুপূর্ণ পাইয়াছি। কত ব্রহ্মপরায়ণ বন্ধুই দিয়াছ। এখনই যদি নৃত্য আরম্ভ হয়, দুবাহু তুলিয়া কতই নৃত্য করিবেন। আপনার সুখ অন্যকে দিতেছি, অন্যের সুখ সকল আপনি লইতেছি। আগে স্বপ্নেও জানিতাম না, আমার স্ত্রী, আত্মীয়, বন্ধু সকলে আমার সহায় হইবেন। শ্মশানে বাড়ী করিয়াছিলাম, সেই বাড়ী যে এত স্বর্গীয় সাধুদের সঙ্গে সম্মিলনের স্থল হইবে, ইহা কি জানিতাম? কত সুখ আসিয়াছে, আরও কত

সুখ আসিবে। বৈরাগ্যকে নমস্কার করি। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার করি। প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে লইয়া গিয়া, তুমি আমাদিগকে সুখী কর, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বাধীনতা।

রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; ২০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস, কখনও কাহারও অধীন হইও না, এই প্রধান সৎপরামর্শ। প্রথম অবধি কায়মনোবাক্যে সাধ্যানুসারে এই মন্ত্র পালন করিয়া আসিতেছি। অধীনতা এই পৃথিবীতে বিষ ; অধীনতা রাশি রাশি নরক যন্ত্রণার হেতু। অধীনতার প্রতি প্রথম হইতেই কেন এত বিরক্ত হইয়াছিলাম, জানি না। মানুষ কাম ক্রোধ তাড়াইবার জন্য, রিপু দমন করিবার জন্য চেষ্টা করে, উৎসাহের সহিত প্রধাবিত হয় ; কিন্তু অধীন হইব না, অধীন হইব না, এ কথা বলিয়া কেহ পাগল হয় না। অবশ্য বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল, এই জন্য জীবনের মূলে এই মন্ত্র নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অধীনতার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অধীনতাকে পাপ মনে করিতাম ; কি ফল ফলিবে, ভাবিতাম না। অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা। ফল না দেখিয়াই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, কেন না মন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রথম হইতেই স্বীকার করিতে হয়। এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট মস্তক হেট করিতে পারিলাম না। ইহার জন্য কষ্টও পাইতে হইয়াছে, তথাপি মন্ত্র ছাড়ি নাই। পাহাড়ের

ন্যায় অটল স্বাধীনতাকে আমি জড়াইয়া ধরিয়া আছি। দেখিয়াছি, এ মন্ত্র সহজ মন্ত্র নয়।

অধীন হইও না, এই যে মন্ত্র, ইহার ভিতরে পরম অর্থ আছে। নববিধান পরে আসিবে, সকল প্রকার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে সত্যের মহিমা মহীয়ান্ করিতে হইবে, এই সকলের জন্যই স্বাধীনতার ভাব আদি হইতে বর্ত্তমান ছিল। স্বাধীনতা হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সঙ্কল্প ব্যতীত, এ ভাব হইতে আর কি ফল ফলিতে পারে? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য্য প্রসূত হইয়াছে। অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না; কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তক বিশেষেরও কিঙ্কর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি তাহারই যশোঘোষণা করা হইবে না। এদিকে যেমন এই সকল প্রতিজ্ঞা, অপরদিকের প্রতিজ্ঞা তেমনই—স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না; অহঙ্কারের অধীন হওয়া হইবে না; ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত লওয়া উচিত, তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না। যতই স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি হইল, দেখিলাম, পৌত্তলিকতা জাতিভেদ প্রভৃতি প্রভুত্ব করিতেছে; দেখিবামাত্রই তৎসমুদয়ের শৃঙ্খল ছেদন করিবার জন্য যত্ন হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশকে পৌত্তলিকতাদির দাস করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদয়কে কাটিবার জন্য খড়্গহস্ত হইলাম। যাই দেখিলাম, ভ্রম, কুসংস্কার পিতা পিতামহকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাড়াতে উপদ্রব করিতেছে, অমনই অস্ত্র বাহির করিলাম।

আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না; এখনও পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্ত্তী, কি রিপুর বশবর্ত্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোন ক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সততই চক্ মক্ করিত। কত অনিষ্ট ফল অধীনতা দ্বারা ফলিয়াছে, ভাবিয়া ঠিক করি নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া যে অস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা নয়। অবশেষে এই মহামন্ত্র, গুরুমন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন করিলাম। এই পৃথিবীতে কত ভাব ভাই ভগিনীকে দাস দাসী করিয়া রাখিয়াছে; তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে বলিয়া, ইষ্টদেবতা এমন শিক্ষা দিলেন যে, অধীনতা দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। রাগের দাস হইতে কাহাকেও দেখিলে রাগের উপরেই রাগ হইত। পিতার দাস, কি সন্তানের দাস হওয়াও সহ্য হইত না; ধনের দাস, মানের দাস অথবা কোন সম্প্রদায়ের দাস হইতে যখনই কাহাকেও দেখিতাম, রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন, আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে। রকম রকম লোক রকম রকম লোকের কাছে পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার এত ইচ্ছা! পাঁচ দশ বৎসর দাসত্বই করিতেছে! এক এক বিশেষ বিশেষ নারীর দাসত্ব করাকে কি বলে? ব্যভিচার বলে। মানুষের দাসত্ব করাকে কি বলে? দাসদলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে লোভী বলে। এ সমস্তই পাপ; দাস হওয়াই পাপ।

আসক্তি সংসারের রাজা হইলে মজিতে হয়। যে প্রাণে

যাই, যে বাড়ীতে যাই, রাগ বলে, দেখ, আমার কত দাস দাসী; লোভ বলে, দেখ, কত আমার চাকর, আমি কত বড় রাজাকে পর্য্যন্ত মারিতেছি। দাসত্ব-বিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয় পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না। কেহ বলেন, গুরুকে মানিও; মন বলে, ভয় করে। পিতা মাতাকে মানিও; আশঙ্কা হয়। বন্ধু বান্ধব যাঁরা, ধর্ম্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিও; আত্মা বলে, বড় ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিও; মন বলিল, অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোন বন্ধুর বিশেষ মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না। খুব বড় বন্ধু দেখিলেন যে, আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এই জন্য আমার বন্ধুরা বলিলেন, খুব যে আমাদের ভালবাসে, তা নয়, ভিতরে এ ব্যক্তি আবার নিজের বুদ্ধিকে দাঁড় করায়; আমরা যা বলি, তা করে না। বন্ধুরা বলেন, এইটী কর; আমি তাহা করি না। অন্যের ভাল কথায় ভাল কাজও করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, ততক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না। এ প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমি সৌভাগ্য-শালী, আমার ইহাতে বিপদ না হইয়া লাভই হইয়াছে।

বন্ধুদিগকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীর অধীন হই নাই; সন্তানাদির

মায়াতে, কি দেশের মায়াতেও আবদ্ধ হই নাই ; হইবও না। কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, জীবিত কি মৃত কোন লোক আছেন, যাঁহার নিকট আমি অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, অথবা যাঁহার মায়াতে আবদ্ধ আছি। স্বাধীনতাই আমার চিরকালের আদরণীয়, কিন্তু ভক্তবিহীন স্বাধীনতা আদরণীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহঙ্কারমূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই। বড় হইবার জন্য, উচ্চপদ লাভের জন্য স্বাধীনতা কিনি নাই, সে প্রকার স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার ; আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি না। আমি ভালবাসিলাম, কিন্তু মায়াবদ্ধ হইলাম না। ইহাই যথার্থ ভালবাসা। তোমাদের ভালবাসিলাম, কিন্তু অধীন হইলাম না। অধীন হইয়া যদি লোক ডাকিতাম, আজ আমার দলে শত সহস্র লোক থাকিত। মায়া দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দাসদলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এই জন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে। এই জন্যই বলি, সত্যের জয়, সত্যের জয়, সত্যের জয়। স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোকে আসে আসুক ; গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না ? দলের সামান্য কাহাকে আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে, তাহা দেখিতে পারি না ; আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য একজন মনুষ্য আমার অধীন হইবে ? পিতার নিকট আমি কি

উত্তর দিব? আমার মত আর একজনের ঘাড়ে আমি চাপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, একজনও যদি কাছে না থাকে, নিজে যখন দাস নই, তখন অপরকেও দাস করিব না।

আমি কখনও দাসত্ব করিয়াছি, তোমরা কি কেহ ইহা জান? আমি যখন কাহারও দাসত্ব করি নাই, তোমরা কেন দাসত্ব করিবে? যে আপনাকে কখনও কাহারও দাস করে নাই, সে যদি অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করে, অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তার মত পাপী কপট আর কে আছে? গুরু আমি নই; অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করি নাই। চিরকাল শিখিয়াছি, অর্থাৎ আমি শিক্ষার্থী; চিরদিনই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার। সত্য সাক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই। এক শত জন লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই আমার সমক্ষে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আমি চলিয়া গেলেও এ কথা প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন। দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও যাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না; প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া

এখানে ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব ; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়। যার উপর দলের ভার আছে, সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবেন না।

প্রত্যেকেরই এক একটী গুরুতর ভার আছে, ব্রত আছে। একটী ভাল মতেরও অন্ধ হইয়া অনুসরণ করিতে চাই না। আমি অন্ধ হইয়া অন্ধ চালিত করিব না। স্বাধীনতা মহামন্ত্র। এতদূর যদি স্বাধীনতা হয়, এ যে স্বেচ্ছাচারের কাছে গেল। স্বাধীনতা পূর্ণ হইবে, স্বেচ্ছাচার হইবে না ; কেন না, এক পিতা মাতাকে মানি বলিয়াই পিতা মাতার অধীন হইলাম না। সেই জন্য এতদূর করিলাম যে, ধর্ম্মেতেও স্বাধীনতার ব্রত লইলাম। সংসারের মায়া কাটাইয়া আবার অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবর্গের দাসত্ব করিলেন। পৃথিবীর কীট হইল না ; কিন্তু হয় ত ধর্ম্মসমাজে আসিয়া এই বইখানিকে অভ্রান্ত ভাবিয়া তাহারই সম্পূর্ণ দাস হইল। আমি আপনাকে এ সকলেরই মায়া হইতে দূরে রাখিয়াছি। কোন এক পুস্তককে কেন অভ্রান্ত ভাবিব? কেন একটী মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহঙ্কারী বলিতে চাও, বল। দুরাচার বলিবে, তাহাও বল। কিন্তু কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন। কোন পুস্তক নাই যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এই জন্য বইকে

আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালবাসি, কে এমন ভালবাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি, তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। আমি বাইবেল পুরাণকে ভালবাসিতে গিয়া পিতার অপমান করিব না। ঈশ্বরের কাছেই আমি থাকিব। স্বর্গে কি পৃথিবীতে, কাহারও দাস হইব না।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম আমার প্রিয়, একতারা আমার প্রিয়। এই দুইয়ের প্রতি যদি আমি আসক্ত হই, ইহারাই আমার নিকট দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে। আজিকার জন্যেই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি। আজ উপাসনার সময় ব্যাঘ্রচর্ম্মকে আদর করিলাম, দুই ঘণ্টা পরে তাহাকে ছাড়িলাম, আর যত্ন করিলাম না। বাহ্যিক ব্রত সাধনাদিরও দাস হইব না। কেহ কি বলিতে পারেন না, কত লোকে টাকার মায়া ছাড়িয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছে? এই জন্য আত্মা সতত সাবধান; অধীন আসক্ত কখনও কোন বস্তুর হইবে না, ফুলে আসক্ত হইবে না, গৈরিক বস্ত্রে আসক্ত হইবে না, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আসক্ত হইবে না। আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি তদ্দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইব, তারপর বলিব, বিদায় দাও মৃদঙ্গ; বিদায় দাও গৈরিক বস্ত্র; বিদায় দাও ব্যাঘ্রচর্ম্ম। আমার কার্য্য হইয়া গেল, আর তাহা লইয়া থাকিব কেন? সে কিছু আমাকে দাস করিবার জন্য আসে নাই। আমার দরকার; তার নয়। অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইব; সিদ্ধ হইলে আর তাহা থাকিবে না। যদি কিছুরও প্রতি আসক্তি থাকে, ব্রতাদির প্রতি যদি একটুকুও আসক্তি থাকে, তবে যে পরিমাণে আসক্তি, সেই পরিমাণে নরকের অগ্নি জ্বলিতেছে।

নববিধানে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কে গুরু? কে ব্রাহ্ম-সমাজ? কে আমার ব্রাহ্মদল? কোন বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্তু যাহা, তাহা রাখিব। নাম পর্য্যন্তও আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে পারি, বস্তু কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না; আর সকলই পারি। এজন্য কাহারও সঙ্গে মিল হইল না। দুঃখ পাইলাম, সুখও অনেক পাইলাম। গুরুগিরি যদি করি, লোক-সংখ্যা বাড়াইতে পারি। কিন্তু তাহা করিতে পারি না। পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি। ইহাতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যাহা হইবার ইহাতেই হইবে। স্বর্গ হইতে স্বাধীন জীবগণের উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকিবে, পিতার কাছে সকলে থাকিবে, স্বেচ্ছাচারী হইবে না। একদিকে যত পাপকে, দম কুসংস্কারকে দাঁড় করাও, অপর দিকে যত প্রকার ভয়ানক স্বেচ্ছাচার, দম্ভ ও অহঙ্কার আছে, তৎসমুদয়কে দাঁড় করাও। অবশেষে এই দুয়ের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতার অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুরুষ! মহামন্ত্র স্বাধীনতা, কি আশ্চর্য্য মন্ত্র! দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে, তবে আমার ও আমার ভাই ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য আমাদিগের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও। গেলাম যে পাপের জ্বালায়; তার উপর দেশাচার, কুরুচি, ভ্রম তোমার সন্তানকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর আবার নানা প্রকার আসক্তি ঘাড়ে চাপিয়াছে। হে ঈশ্বর, ঐ ওরা আমাকে কিনিয়া লইবে, ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে, এই বলিয়া কাঁদিতেছি। মা, কোথায় তোমার দাসত্ব করিব, না

কার কাছে রহিয়াছি! সংসারের প্রভুর সেবা করিয়া মরিতেছি। স্কন্ধের উপর, মনের উপর, অসহ্য দাসত্ব-ভার রহিয়াছে। অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতা-প্রদাতা, কোথায় রহিলে আজ? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে? অধীনতার ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিস্বরূপা, হুঙ্কারে শত্রুদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব না। মা আনন্দময়ি, আর পাপের দিকে যাব না; রিপুপরতন্ত্র আর হইব না। যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব; যেখানে যাইতে বলিবে, সেইখানে যাইব; যাহা খাইতে বলিবে, তাহাই খাইব; যাহা নিষেধ করিবে, তাহা কখনই করিব না। কোন প্রকার কু অভ্যাসের দাসত্ব করিব না। বড় কষ্ট হয় সে অবস্থায়, বিবেক যখন মনকে বলে, এমন যিনি ভালবাসেন, সেই মার আদেশ পালন কর্‌লি না? তাঁর কথা অগ্রাহ্য কর্‌লি? তাঁকে অপমান করিতেছিস্? বুঝিতেছি, মা, অধীনতা, দাসত্ব ভয়ানক নরক! তোমার পাতকী সন্তানকে উদ্ধার কর। লোহার শিকল ছিঁড়ে দাও, ভাই বন্ধুদের লইয়া স্বাধীন পাখী হইয়া উড়িয়া বেড়াই; স্বর্গের বাগানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করি; স্বর্গের ফল ভক্ষণ করি। আর যেন অধীনতা-পিঞ্জরে না থাকি। আকাশ-বিহারী স্বাধীন পক্ষী আকাশে উড়ুক। দয়াময়, দয়া কর, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার দেওয়া স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া যেন সুখী হই। পিতা, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবেক।

রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে। যে ব্যক্তি প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী, এই প্রকার কথা, ভিতরে এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তাহাকে প্রেতবাণী বলিয়া মনে করি নাই এবং কখন করিবও না; এই জীবনের এই আর একটী বিশেষ কথা।

একজনের ভিতরে আর একজন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে দুইটী জিহ্বা থাকে, দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, এ অনেকবার অনেক ঘটনায় দেখা গিয়াছে। মানুষ কথা কয়, বিচার করে, বিচার করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে। আমি ভাবিয়া ধর্ম্মপথে আসি নাই, এ কথা বারবার স্বীকার করিয়া আসিতেছি; কিন্তু 'আমি'র মধ্যে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে যাহা আমি নই, এমন একজনকে স্পষ্ট অনুভব করি; তাঁহার কথা শুনিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিতে চাই। এক জন যে ভিতরে কথা কয়, এই পরীক্ষিত সত্য বারবার অনুভূত হইয়াছে। কেহ কেহ ভিতরের এই বাণী শ্রবণ করেন না, তাহা জানি। ইহা শুনিতে শুনিতে কুসংস্কার হয়, ইহা প্রেতবাণী, ইহা শুনিলে অকল্যাণ হয়, অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ বাণী যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে পাগলের শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে

হয়, এ সংস্কার কাহারও কাহারও আছে। কেবল এ দেশে নয়, সকল দেশেই লোকের এরূপ সংস্কার দেখা যায়। আমি ছাড়া আর একজন আমার ভিতরে আছে, এ কথা যদি কেহ বলে, দশজনে সভা করিয়া তাহাকে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত করে। ইহা যদি উন্মাদের ব্যাপার হয়, তবে আমি এ প্রকার উন্মাদগ্রস্ত হইতে অভিলাষ করি। ইহা ধর্ম্মের উন্মত্ততা;—পরিত্রাণের উন্মত্ততা। কেন না, আমি ইহাকে ভূতের বাণী বলি না; ব্রহ্মবাণী বলি।

এই বাণীর প্রতি আমি এক চুলও অবিশ্বাস করিতে পারিনা। যখনই এই শব্দ শুনিয়াছি, যতবার এই অদৃশ্য প্রাণবিশিষ্ট পুরুষের কথা —স্পষ্ট স্বর শ্রুতিগোচর হইয়াছে, ততবারই, বুঝিয়াছি, এ শব্দ বন্ধুর নয়, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের নয়, আমার নিজের নয়, পুস্তকের শিক্ষিত সত্য নয়, পূর্ব্বকালের কথা স্মরণপথে সমুদিত হইল, এরূপও নহে; কল্পনাদেবী ভাল ভাল রং দিয়া মনের মধ্যে চিত্র করিলেন, তাহাও নয়। কোন পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, কি কোন সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার জন্য তিনিই বলিতেছেন। কোন নূতন কার্য্যের সূচনা করিতে, কি কোন নূতন স্থানে যাইতে তিনিই আদেশ করিতেছেন। তিনিই বলিতেছেন, কোন পাপ বিনাশ কর, কোন কুরীতির প্রতি খড়্গহস্ত হও। আমি এ সব বিষয় ভাবিয়া ঠিক করিতেছি, কি নিজে এই সকল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা একবারও মনে হয় না। যিনি স্বভাবকে এই প্রকার স্বভাব দিয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন, আপনার ভিতরে এই প্রকার শব্দ শুনিলে লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। বুদ্ধি চেষ্টা করিয়া, কত উপায় অবলম্বন করিয়াও এই বাণীকে তাড়াইতে পারি নাই। আমি

একজন প্রধান ব্যক্তি, আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, আমি বুঝিতেছি, কষ্টের পথ আমি ছাড়িতেছি, আমার সংকীর্ত্তি দশ সহস্র লোকের কাছে থাকিয়া যাইবে, এ প্রকার আশা ও চিন্তা অনেকেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে অনেক কার্য্য করিয়াছি, এই কার্য্যগুলি আমার কার্য্য নয়, এ ভাব আমার ভাব নয়, কারণ মনের ভিতরে আর একজন কথা কন, ইহা আমি অনুভব করিয়াছি, এরূপ কথাও অনেকে স্বীকার করেন।

আমার যেমন ভাব ও প্রকৃতি আছে, তাঁরও তেমনই আছে। আমার যেমন সিদ্ধান্ত আছে, তাঁরও তেমনই সিদ্ধান্ত আছে। এক জীবাত্মা, আর এক পরমাত্মা। দুই স্বতন্ত্র; বিশেষ্য একটা, বিশেষণ দুইটা। আত্মা পদার্থে দুই বিশেষণ মিলিত। এক জীব; আর এক পরম। জীব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম যিনি, তিনিও কথা কন আত্মার ভিতর। দুই জনেরই রসনা রসাস্বাদন করে। দুই ব্যক্তি অনুভব করা অনেকের পক্ষে সাধনের ব্যাপার। এই যে ভাল কথা গুলি, এ সব ঈশ্বরের; আর মন্দ কথা, কুবুদ্ধি, অসৎ পরামর্শ, অবিদ্যা সমস্তই আমার। বারবার যদি ভাবা যায়, কল্যাণ যত সব ভগবানের, অমঙ্গল সমস্ত আমার; সুখ ও সুস্থতা তাঁর, অসুখ ও দৌর্ব্বল্য আমার। মনোবিজ্ঞানের প্রণালী সহকারে যদি এইরূপ ভাবি ও সাধন করি, তাহা হইলে অসৎকার্য্যের জন্য নিজে লাঞ্ছিত হইব, আর ভাল কার্য্যের জন্য সুখ্যাতি, গৌরব ঈশ্বরকে দিব। কাহারও পক্ষে ইহা উপার্জ্জিত ভাব, উপার্জ্জিত জ্ঞান; কাহারও পক্ষে এরূপ প্রকৃতি স্বাভাবিক।

দুইটী পক্ষী সর্ব্বদাই গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখী

দুইটীর গায়ের রং অনেক পরিমাণে এক ; গলার স্বরও অনেকাংশে এক। সাদৃশ্যও আছে, বিভিন্নতাও আছে। স্বভাবতঃ যাঁহাদের এই ভাব মনে হয়, যাঁহাদের এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, তাঁহাদের মনে সততই দৈববাণী শোনা যায়। এখন যেমন বজ্রধ্বনি হইতেছে, এমনই শব্দ করিয়া ব্রহ্মবাণী হৃদয়কে তোলপাড় করে। অনেকের মনে দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কখনও মনে করে, এই সত্য প্রার্থনার পর লাভ করিলাম ; কখনও মনে করে, বই পড়িয়া বুদ্ধি খাটাইয়া উপার্জ্জন করিলাম। কখনও মনে হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাই ভগবান জ্ঞান দিলেন ; আর কখনও মনে হয়, ভগবানের ধার আমরা ধারি না। যখন সাধন দ্বারা বিনয়-সম্পন্ন হয়, তখন উচ্চ উচ্চ সত্য সকল যে বুদ্ধির উপার্জ্জিত নয়, উচ্চ উচ্চ ভাব সকল যে কল্পনার ফল নয়, তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যেখানে বিশ্বাস উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইখানেই শুভ ফল লাভ করা যায়। স্পষ্ট জানিতেছি, এই ওঁর, এই আমার। আমার রুচি বলিতেছে, তুই মদ্যপান কর, বিলাসসুখ অনুভব করিতে থাক্ ; আর এক বাণী বলিতেছে, আমার পথ অবলম্বন কর, ইহাতে ছিন্ন বস্ত্রও পরিতে হইতে পারে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া থাকা হইতেও পারে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহাতেই তোমার মঙ্গল। আমার যুক্তি বলিতেছে, খাওয়ার কষ্ট বৈরাগ্য ; আর এক যুক্তি বলিতেছে, তোমার যুক্তিতে চলিলে হইবে না! আমি যখন বলিতেছি, তখন অন্ধকারের পথই ভাল। সহস্র যমদূত থাকিলেও সেই পথে যাইতে হইবে।

এই অধমের জীবনে এমন পরীক্ষার ব্যাপার অনেক হইয়াছে।

যেখানে আপনার বুদ্ধি দেখাইতেছে, দৈন্য, অসুস্থতা, গঞ্জনা ও অপমান, সেইখানে অপর দিকে কেবল একটী লোক বলিতেছে, "কুছ পরওয়া নেই।" মন আর কোনও কথা শুনিল না। কিরূপে মনুষ্যের বুদ্ধি ভবিষ্যতে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া বলিবে, এই আমার ভাল পথ? এখনই দেখিতেছি, যন্ত্রণার আরম্ভ। হয় ত চল্লিশ বৎসর আরও বাঁচিতে হইবে, দেখিয়া শুনিয়া অন্ধকারের পথে প্রেতের কথা শুনিয়া চলিব? এরূপ একটু সন্দেহও আমি করিতে পারি নাই। একজনের কথা এমনই মিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল যে, তাহারই অনুসরণ করিলাম। আমার কথাকে কুমন্ত্রণা বুঝিলাম, ভাল ভাল বন্ধুদের কথাকেও অযুক্তি মনে করিলাম। ভিতরে চুপি চুপি কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বলিলাম, "থাকে প্রাণ যায় প্রাণ, তোমার ঐ পদাশ্রয় লইব।" বার বার ইহারই জন্য আত্মীয় কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; বহু কষ্টের মুখে পড়িতে হইয়াছে, আপনার লোককে ছাড়িতেও হইয়াছে। একবার আলো হয়, আবার ঈশ্বর বলেন, অন্ধকারে যা। যখনই ভূতের কথা বলিবে, তখনই তোমার মৃত্যু, ভগবান্ এই ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহ বিশ্বাস করিলাম; প্রেতের কথা নয়, অদৃশ্য ভগবানের কথা। যিনি জীবাত্মায় মিশিয়া আছেন, তাঁহারই কথা।

যতই যোগ সাধন করিলাম, মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলাম, মনের ভিতর বুঝিলাম, জীবরূপ বাড়ী দোতালা; নীচে জীব, উপরে ব্রহ্ম। জীব-বৃক্ষে দুইটী পাখী; এক ছোট পাখী জীবাত্মা আর এক বড় পাখী পরমাত্মা। বুঝিলাম, ছেলেবেলা হইতে যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা অলৌকিক নয়; জীবের জীত যাহাকে বলি, তাহা

কাটিলে দুই অংশ দেখিতে পাই। একটা বেদ বেদান্ত বলে, আর একটা মরণের কথা বলে। এক স্থূল রসনা অসার কথা বলে, আর এক সূক্ষ্ম রসনা "হরি হরি" বলে। কাণ বধির হইলে "হরি হরি," শোনা যায় না, "টাকা টাকা" শোনা যায়। চেষ্টা কর, সূক্ষ্ম রসনার মিষ্টবাণী শুনিবে। যে শোনে নাই, তার বিশ্বাস কত দূর বলিতে পারি না। যাহারা এ পথে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে। আমার এ বিশ্বাস এখন যে কেহ হাসিয়া উড়াইবে, তাহা পারিবে না; বিশ বৎসরের বিশ্বাস নড়াইবার ক্ষমতা যে কাহারও আছে, মনে করি না। দুইটি পুরুষের স্বর মন হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায় না।

লেখা পড়া করি আমি, টাকা আনি আমি, ধর্ম্মসিদ্ধান্ত করি আমি, এইরূপ ভাবিয়া প্রধান হইতে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু আর একজন ভিতরে আছেন, তাঁর কাছে গেলেই আমি হই দাস, ভৃত্য। একটি মহাসাগরের কাছে আমি হই ছোট ডোবার মত, খানার মত। প্রকাণ্ড সূর্য্যের কাছে আমি হই একটি ক্ষুদ্র দীপ; একটি সুবিস্তৃত অট্টালিকার কাছে আমি হই একটি ছোট ঘর। আমি প্রধান, কিরূপে বলিব? এই আমি বলিলাম, যাই আমি টাকা আনি, অমনই আর একজন বলিলেন, "খবরদার, যাস নি"। সহস্র লোক বলিতেছে, এ কার্য্য করিও না; ভাল লোকে পর্য্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, অপমানের সীমা থাকিবে না; কিন্তু ভিতরের চুপি চুপি কথা গুর্ গুর্ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। মোহ-জাল চারিদিক হইতে অপর সকলে ছড়াইতে লাগিল, কুপরামর্শের পাথর চাপাইতে লাগিল, কিন্তু

তাহাতেও গুর্ গুর্ শব্দ থামে না। দিনের বেলা সেই শব্দ শোনা যাইতে লাগিল; রাত্রিতেও সেই শব্দ উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভিতরের গম্ভীর ভাব আরও বাড়াতে লাগিল। বড়ই কষ্টের ব্যাপার হইল। আমি বলি, বামে যাই; সে বলে, দক্ষিণে যাও। আমি বলি, সুখ সম্পদ; সে বলে, 'না'। আমি বলি, আলো, সে বলে, অন্ধকার। বারবার ভিতরের পুরুষ কথা কয়। আপিসের আদালত খোলাই রহিয়াছে; একটু ছুটী নাই।

ভগবান্ বলিতেছেন, ভিতরে ইহাই ভাবিতে হয়, নতুবা সাত শত ভূতের জ্বালায় আপনাকে জ্বালাতন বোধ করিতে হয়; মনে হয়, সুখ শান্তি আমি আর পাইব না; এদিকে ওদিকে ভূতে ছিঁড়িয়া খাইতেছে, এমনই কষ্ট হয়। এত বিদ্বান্ হইয়া ভিতরের এই একজনের মতে চলিব? এত শাস্ত্রকারের কথা ছাড়িয়া এর কথা শুনিব? অত বড় পণ্ডিত যে সক্রেটিস্, তিনি এই ভূতের কথা শুনিতেন। তাঁর মত সুবিদ্বান্ আপনার কথা ছাড়িয়া ইহার কথায় চলিতেন। দৈববাণীকে আপনার বুদ্ধির কথা বলিতে পারা যায় না। যদি কেহ বল, ঠকিবে। এ বিষয়ে আমার বিচার-নিষ্পত্তি অন্য প্রকার হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি রসাতলে যায়, এ বিশ্বাস আমি ছাড়িব না। ফলাফল বিচার করিয়া বিশ্বাস করি নাই; ফলাফলের উপর বিশ্বাস নির্ভর করে না। দশজন এ প্রকার পথ ধরিয়া মন্দ পথে গিয়াছে বলিয়া, ইহা ছাড়িব না। দশজন জাল করিয়াছে, অতএব আমি টাকা ছাড়িব, ইহা হইতেই পারে না। অর্থের অন্বেষণ যাহারা করে, তাহারা করিবেই করিবে। কেহ মরিল বলিয়া যারা বাঁচিতেছে, তারা আর বাঁচিবে না?

দুইটী পুরুষ যখন দেখিতেছি, আমি আর ভগবান্, একজনের কথায় অবিদ্যা ও দুর্নীতি, আর একজনের কথায় যত শাস্ত্র, তখন দুইজনকে কেন একজন মনে করিব? ঈশ্বরের প্রশংসা কেন নিজে হরণ করিব? নিজের দোষ কেন ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপ করিব? তুমি বলিতে পার, ইহাতে মানুষ আপনার কথা ঈশ্বরের বলিয়া প্রচার করিতে পারে। হে জীব, তুমি বলিতে পার, "তোমার যদি ভাল খাইবার সাধ যায়, তুমি ঈশ্বরের মুখ হইতে তদনুযায়ী কথা বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিবে। নিজের দুষ্কর্ম্ম ও কামনার মত বাণী সকল ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির করিবে।" কিন্তু কেহ প্রবঞ্চক হইতে পারে বলিয়া আমি ধর্ম্ম ছাড়িতে পারি না; এই বিশ বৎসরে কতবার কথা শুনিলাম, কত কথাই শুনিলাম, একবারও আমি প্রতারিত হইলাম না। এই বিশ বৎসরের মধ্যে একটি বারের জন্যেও এ বিষয়ে আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমি দেখিতেছি, জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বাটিতে গোলা। আমি মনে করি না, একজন স্রষ্টা আকাশে, আর আমি একাকী পৃথিবীতে পড়িয়া আছি। আমার হাতের ভিতরে তাঁর হাত, আমার রসনার ভিতরে তাঁর রসনা, আমার প্রাণের মধ্যে অনন্ত প্রাণবায়ু। বিশ্বাস যখন করি, জিহ্বা যখন নড়ে, তখন দেখি, দুই জিভ্ একত্র নড়িতেছে কি না? পাপীর জিভ্ যদি নড়ে, কাটিতে ইচ্ছা করি। বলি, ভগবানের রসনা, তুমি কি বলিবে বল। তাদের কথা মানি না, যারা ইহাকে অনুমান বলে। সন্দেহ আমার একটুও নাই; একটু সন্দেহ থাকিলে বেদী হইতে বলিতাম না। দুইটী জিভ্ যখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সে অবস্থায় তুমি কি বলিবে? তুমি কি বলিবে,

জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বারবার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা কহিতেছ, সেইখানে বড় আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব আমি দ্বৈতবাদী; দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা, আর একজন আত্মাকে চালাইতেছেন। যখন আমি বলি, আমার কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়, তেমনই যখন তিনি বলেন, তাঁরও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিত্তলের তারের শব্দের ন্যায় নয়, নদীর তর্ তর্ শব্দ, কি পাখীর সুস্বরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্য্যকর ও অত্যন্ত সুস্বর। সেই কর্ণ তাহা চেনে যে কর্ণকে ঈশ্বর ক্ষমতা দান করেন। আমি যেন আরও ব্রহ্মবাণীতে বিশ্বাস লাভ করি; তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ ধরিয়া আপন আপন কল্যাণ সাধন কর।

হে দীনবন্ধু, হে অন্তরাত্মা! আমার জীবনের কোন্ অংশে তুমি লুকাইয়া আছ, জানি না। কাণ শুনিতেছে, ভিতরে একখানা বেদ পাঠ হইতেছে, একখানা নূতন শাস্ত্র পাঠ হইতেছে; কে পড়িতেছে, জানি না। একজন বিচারপতি সর্ব্বপ্রধান হইয়া বিচার করিতেছেন কোথায় তার বিচারালয়, জানি না। আমার অস্থির ভিতরে থাকিয়া কেবল স্বর দ্বারা পরিচয় দিতেছ। আমার অন্ধকার আত্মার ভিতরে থাকিয়া তুমি শব্দ করিতেছ। পোড়ো বাড়ীতে শব্দ শুনিলে লোকে যেমন ভীত হয়, অনেক সময় প্রাণের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া তেমনই ভীত হইতে হয়। হৃদয়ের এক অন্ধকার গলির ভিতরে শব্দ শুনিলাম; যেমন শুনিলাম, ভাবিলাম, এ কে? কে আমাকে

রুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম, ভগবান্—আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর! তুমি গাছের ভিতর, সূর্য্য চন্দ্রের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে, তুমি জগতের কৌশলে একজন রহিয়াছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি একজন থাকিয়া মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীতে না দেখিয়া যদি কখনও উদাসীন হই, অন্তরের বাণী কখনই নিদ্রা যাইতে দেয় না। একটা অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হব হব মনে করিতেছি, অমনই ধাক্কা মারে। ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে যাই, দৈববাণী যেন কাণে লাগিয়াই আছে। কাণ যদি ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, তবু যে ঐ শব্দ শোনা যায়। তনু যদি ভস্মসাৎ হয়, তবু ঐ আগুন জ্বলিতে থাকে। এমনই তোমার বাণী, যেন সহস্র নদীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধারা এক ধারায় মিলিয়া পাহাড়ের উপর পড়িতেছে। কোন মতেই ও শব্দ ভুলিতে পারি না। তোমার কথা, আমার কথা, উভয়কে এক বলিতে কোন মতেই পারি না। বাক্য তোমার এমনই মিষ্ট যে, তোমার কথা শুনিয়া আমি কখনই কষ্ট পাইলাম না। কখনও কুমন্ত্রণা দিয়া দাসকে মন্দ কার্য্য করাইয়াছ, ইহা কোন মতেই বলিতে পারি না। যত বাণী ধরিতে পারিয়াছি, প্রত্যেকটাই অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী। কখনও দেখিলাম না, ব্রহ্মবাণী কল্পনা করিয়া ভ্রম হইল। একদিনের জন্যও অনুতাপ হইল না। যখনই ধরিয়াছি, ঠিক ধরিয়াছি; ব্রাহ্ম হইয়া যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তব দর্শনে কি ভয় লোকভয়ে? কি ভয় কল্পনাভয়ে? বিশ বৎসর এ ব্যবসায় চালাইতেছি, এ দাস কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; প্রতিবারই লাভ হইয়াছে। শুভক্ষণে ব্রহ্মবাণী মানিয়াছি, তাই এত

দিনে এত সঞ্চয় করিয়াছি। হে মা, যত লোকে তোমার আশ্রয় লইয়াছে, সবাই যেন ব্রহ্মবাণী আশ্রয় করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। সবাই ছাড়িলেও তোমার কথা শুনিয়া যে কি সুখ হয়, কেমন শান্তিধারা বক্ষের উপর পড়ে, তাহা জানিয়াছি। হাত যোড় করিয়া তাই এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনার কুভাব, পরের কুমন্ত্রণা ছাড়িয়া, মা! তুমি কি বলিতেছ, তাই যেন শুনি। জননি, তুমি কি বলিতেছ, এই যেন কেবল সকলে জিজ্ঞাসা করে। পৃথিবীর বেদী নিস্তব্ধ হউক; মা, আমার বাহিরে ভিতরে বাস করিয়া চুপি চুপি কথা কও। তোমার কথা আমার মিষ্ট সুধা লাগে; অন্যের কথা বিষ বোধ হয়। বারবার কথা কও; কৃপাময়ি, তোমার কথা শুনিয়া পাপকে বধ করি, পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করি, কাঙ্গাল বলিয়া একবার তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

সপ্তম অধ্যায়।

ভক্তিসঞ্চার।

রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে পাঠক, এই জীবনবেদ আশার বেদ। হে শ্রোতা, এই জীবনের অনেক কথা আশাপ্রদ, এবং উৎসাহ-উত্তেজক। কেন না, সকলই লইয়া ত একেবারে পৃথিবীতে আসি নাই; সাধনোপার্জ্জিত সত্যের বিষয় শুনিলে, হরিনামের গুণে আয়াসলব্ধ সত্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত ব্যাপার জানিলে, কাহার না হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হয়? এ জীবনের দুর্ব্বল বিভাগ, অভাব ও অন্ধকারের বিভাগও আছে; তাহা জানিলে অত্যন্ত নিরাশ ব্যক্তির অন্তঃকরণেও আশার সঞ্চার হইবে। যত্নপূর্ব্বক এই বিষয় শ্রবণ কর। এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর ব, স্মরণের পক্ষে সুযোগ। তিন লইয়া এই সাধক ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল। যখন সময় হইল, আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করা হইল। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য তিনই শুষ্ক কঠোর। তিনই ভাল পদার্থ বটে, ধর্ম্মের বাজারে তিনেরই দাম কম নয়, অবস্থাবিশেষে এ সকলও দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে এই তিনটী আমার প্রথমে ছিল। ভাল হব, দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিব, কঠোর হইয়া ইন্দ্রিয় দমন করিব, ঈশ্বরের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিব, এই সকল ভাবই মনের মধ্যে উঠিত।

বিবেক বৈরাগ্য খুব সহায় ছিল। "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে", প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলাম।

এত কঠোর যে জীবনের আরম্ভ, সেখানে ভক্তিরস কিরূপে দেখা যাইবে? তাহার প্রত্যাশাও তখন করিতে পারা যায় নাই; ভক্তি অতিশয় আবশ্যক, ইহাও তখন মনে হয় নাই। মাতৃচরণকমল কি, তাহা বুঝিতাম না। বিবেকের রাজার কাছে প্রার্থনা করিতাম। অপরাধী, বন্দী, বৈরাগী, তপস্বীদের ঈশ্বরের কাছে থাকিব, এই অভিপ্রায় ছিল। একজন বিশ্বাসী পরব্রহ্মের উপর নির্ভর স্থাপন করিল, এই খেলাই দেখিতাম; ভক্তের খেলা দেখি নাই। তখন আকাশে সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না পাই নাই। বিবেক হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, খুব আলোকিত করিতেছে, ইহাই অনুভব করিতাম। পাপকে বলিতাম, আসুক দেখি, কেমন পাপ! হৃদয়ের মধ্যে কেবলই জ্বলন্ত অগ্নি প্রকাশ পাইত; প্রলোভনকেও অগ্রাহ্য করিতাম। কিন্তু যে আনন্দ ভক্তিতে উৎপন্ন হয়, সে আনন্দ হৃদয়ে ছিল না। পুণ্যবান্ হইলে, জিতেন্দ্রিয় হইলে যাহা হয়, তাহা ছিল। সে সন্তোষ, সে তৃপ্তি; আনন্দ সে নয়। আনন্দময়ীর পূজা ব্যতীত আনন্দ হয় না। বিবেকের রাজাকে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিলে সন্তোষ হয়; আনন্দ হয় ভক্তির সহিত আনন্দময়ী জননীর পূজাতে। এরূপ অবস্থা যদি কাহারও হয়, আশার সহিত তাহাকে বলি, ভ্রাতঃ, নিরাশ হইও না, নিরাশ হইও না। ধর্ম্ম যদি ভয়ে আরম্ভ হয়, পরিণত হইবে ভক্তিতে ও আনন্দে। আজ যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবন ভাল কর, কাল দেখিবে, সেখানে ভক্তি-কুসুম ফুটিয়াছে।

আনন্দবাদীদের মধ্যে আমার যে প্রবেশ হইবে, এরূপ আশা ছিল না। যদিও কোনও কোনও স্থলে মাননীয় বন্ধুদের নিকট "ব্রহ্মানন্দ" নাম পাইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তর তাহাতে সায় দিত না; অন্তর বলিত, তুমি ইহার উপযুক্ত নও। কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া আমি কেবল আপনাকে আপনি বলিতাম, এ ছাড়, ও ছাড়, ছাড় ছাড়; কেবল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, কেবল পরাক্রম প্রকাশ কর, অপৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচার কর। শান্তিরস, কি ভক্তিরসের আশা হয় নাই; মার পানে তাকাইব কেমন করিয়া, জানিতাম না। কেবল পিতাকে ডাকিতাম, মার অন্তঃপুরের দ্বার তখন খোলা হয় নাই। কেহ বলিয়াও দেয় নাই, কোন্ পথে গেলে মাকে দেখা যায়। "জননী সমান করেন পালন" শুনিতাম কেবল রূপকজ্ঞানে। ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় নাই; মা বলিবা মাত্র তখন প্রাণ একেবারে মাতিয়া উঠিত না; অল্পই কাঁদিতাম। হৃদয়ে তখন কবিত্বের অভাব ছিল। অবশেষে মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরূপে, আশ্চর্য্য! তখন বিবেক-প্রধানই ছিলাম; সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেক-প্রধান ছিলেন। এক চরিত্র পুনরুৎপন্ন হইয়া অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল। পাঁচ জন, দশ জন, এক শত জন যুবার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শ্রীমৃদঙ্গের নাম শোনা যায় নাই; শ্রীহরিকে ডাকিতে শিখি নাই; শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। শ্রীনাথ, শ্রীপতি প্রভৃতি নাম তখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তখন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই। খোল বাজে নাই; একতাও সংকীর্ত্তন প্রস্তুত হয় নাই। ভিতরে যেমন এই অভাব ছিল, বাহিরেও ইহার সায় পায় নাই। অন্তরে বাহিরে

কেবল বিবেকসাধন, বিশ্বাস বৈরাগ্যসাধন; অল্প পরিমাণেই [illegible]-ছিল।

মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল; কত দিন একরূপে চলিবে? তখন বুঝিলাম, এত ঠিক নয়, অনেক দিন এইরূপে কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিনিতে হইবে। যত দিন অন্তরে তত বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে, বিধাতা ও কেমন গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম, যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারি না, এখন ভক্তি অধিক, কি বিবেক অধিক; আনন্দ অধিক, কি তপস্যা অধিক; সুখ অধিক, কি কঠোর ধর্ম্মসাধন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; শান্তি আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম। এখন তারতম্য নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন এরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছি যে, মনে হয়, ভক্তি আমার স্বাভাবিক। প্রথমে শুষ্ক ভাবে কেবল পুণ্যসাধনই আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভাবিতাম, কিসে সচ্চরিত্র হইব, কিসে ভাল ভাবে চলিব, কিসে সব ছাড়িয়া ফকিরের মত থাকিব। ভগবান্‌কে লইয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না। ইতিপূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মৌনাবলম্বন করিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। যাহা স্বভাবে থাকে, তাহাই হয়; যাহা না থাকে, তাহা হইবার নহে; অনেক পণ্ডিতের এই প্রকার মত। উপার্জ্জিত ধর্ম্ম কথার কথা। যাহার ভক্তি নাই, তার ভক্তি হয় না; যার বিশ্বাস নাই,

তার বিশ্বাস হয় না; যার ভক্তি স্বাভাবিক, তারই ভক্তির উৎকর্ষ হয়; যার ধর্ম্মের আরম্ভ ভয়েতে, ভয়েতেই তাহার ধর্ম্মের শেষ হয়; অনেকে এই প্রকার মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি বলিতে হয় বলিব, আমি কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, আনন্দে মগ্ন হইয়াছি।

আমার যেমন হইয়াছে, এমনই সকলেরই হয়। প্রথমে ব্রহ্মকে বিশ্বাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী নাম পাইয়াছিলাম, এক্ষণে ভিতরে সুখভোগ করিতেছি। প্রথমে কঠোর, পরে সুকোমল; প্রথমে পিতা, পরে মাতা। ব্রহ্মের প্রস্ফুটিত ভাব জীবনে দেখিলাম। আমার জীবনের সঙ্গে ব্রহ্ম খেলা করিতে লাগিলেন। আগে "ব্রহ্ম" নাম একটি নাম ছিল, বস্তুটি রূপান্তর হইয়া কত নামই ধরিল। আমি যেমন আমার ব্রহ্মকে দেখিলাম, ইচ্ছা হয়, তেমনই করিয়া সকলেই দর্শন করেন। কেন না, যদি একজনের সম্বন্ধে অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে, তবে সকলের সম্বন্ধেই হইবে। শুষ্ক কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া যে কাঁদিতেছিল, সে হাসিতেছে; এ সংবাদ সকলের জানা উচিত। ঈশ্বরজ্ঞান অল্প ছিল, বাড়িল; হাত যোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি, তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কত রূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখনও শক্তির সহ আনন্দ সংযুক্ত দেখিলাম; কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম। মার রূপ নানা ভাবে মা দেখাইয়াছেন। আরও কত ভাবের রূপই সম্মুখে আসিতেছে। কেহ যেন না বলেন, মার সব রূপ দেখিয়াছি। এই ভক্তিশাস্ত্র সম্প্রতি আমরা দেখিতে

আরম্ভ করিয়াছি। যত ভক্ত হইব, ততই আনন্দময়ীর রূপ দেখিতে পাইব; আমাদিগের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নানারূপ দেখিতে সক্ষম হইব। এই উপার্জ্জনের দিন। যাহা আমাদের ছিল, তাহার উৎকর্ষ হইয়াছে; যাহা নাই, এ সময় তাহাই আনিতে হইবে। অদ্যকার উপদেশ যেন এই বিষয়েই ফলপ্রদ হয়।

আমার যাহা ছিল না, তা হইয়াছে। এক সময়ে ভক্তিভাব ছিল না। গান করা আমার পক্ষে এক সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দশ জনের সমক্ষে যে আমি গান করিতে পারিব, ইহা আমার মনেই হইত না; কখনও যে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিব, জানিতাম না। এখন মনে হইতেছে, মাকে দেখিয়া বুঝি, একেবারে পাগল হইয়া যাই। যে আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই, তার ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় নাই। যে আমার মাকে না দেখিয়াছে, তার যে কিছুই হয় নাই। সকলের বাড়ীতেই এই মা যাবেন। এখন জোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, এই সকল লোকের বাড়ীতে মা নিশ্চয়ই গমন করিবেন। এক স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, অপর স্থানে তাহা ঘটিবেই। প্রেম নাই? ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া সকলের মন শুষ্ক হইয়াছে? প্রেম হইবে না? তা ত নয়; আমার যখন দুর্দ্দিন গিয়াছে, তখন তোমাদেরও যাইবে। সুদিন আসিবেই আসিবে; অভক্তেরও আশা আছে। আমার আশা ভক্তি আরও বাড়ুক। আমি অল্প পাগল হইয়াছি, আরও পাগল হই। এমন পাগলের ভাব, ভক্তির ভাব আমার হউক, যাহাতে পৃথিবীর অত্যন্ত অপছন্দ হয়। যাতে পৃথিবী আরও গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চর্য্য ভাব শীঘ্র

শীঘ্র বর্দ্ধিত হউক। সেই সমস্ত লইয়া জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচি।

এত শুষ্কতার পর এত ভক্তি আসিল? এমন মাকে আমি দেখিলাম? এমন ভক্ত আছেন, যখন আমার মনে ভক্তি হয় নাই, তখন তাঁদের মনে ভক্তি দেখা দিয়াছিল। তাঁরা কেন মৃদঙ্গ আনিলেন না? তাঁরা কেন সঙ্কীর্ত্তন প্রথম করিলেন না? মার মন্দির তাঁরা কেন প্রকাশ করিলেন না? যদি একজন অভক্ত মাকে দেখিয়া নাচে, কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে চড়াৎ করিয়া লোকের হৃদয়ে শুভ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা আসিবে। লোকে বলিবে, "কি! এ লোক ভক্তির কথা বলে! এ যে বিবেক লইয়া দেশে দেশে বেড়াইত; এ ত ভক্তিমার্গ ধরে নাই। এ কেন বাজাইতেছে? তবে বুঝি, হরি আস্‌ছেন। 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' এই কথা বুঝি প্রমাণিত হইবে!" এই বলিয়া সবাই ভক্তির পথ ধরিবে বলিয়াই ইহা হইল। আমি ভক্তিতে ডুবিয়া বুঝিলাম, ঈশ্বরের খেলা। প্রাচীন ভক্তেরা ত একটু ইসারা করিতেও পারিতেন; আমাকে কেহ কিছুই বলিলেন না। "হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; হে ভগবান, বাঁচাও" এই বলিয়া বলিয়া দিন যাইতেছে; শীঘ্র ভক্তির পথ আন, এ কথা ত কেহই বলিলেন না। কেবল একজন বলিলেন; যাঁর বলিবার, তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে প্রার্থনার বলে। যা কিছু অভাব, সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই আছে। বিশ্বাস-হিমালয় আছে, ভক্তি-সরোবর আছে। যেমন বৈরাগ্য, তেমনই প্রেম। মা আমার এক হাতে বৈরাগ্য খাওয়ান, অপর

হাতে প্রেম খাওয়ান; দুষ্ট হাতে কেবলই খাওয়াইতেছেন। শ্রীহরি মহাপ্রভু হইলেন; ভক্ত-সরোবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন।

হে দীনশরণ, হে কৃপাসিন্ধু! অপার তোমার প্রেম; অদ্ভুত তোমার করুণার লীলা। কিরূপেই আমি প্রথমে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। কি ভয়ানক রূপ দেখিয়াছিলাম, আর কি সুখের কুসুম হৃদয়-সরোবরে এখন ভাসিতেছে। কেমন করিয়া তুমি এমন সুন্দর রূপ দেখাইলে? কোথায় ছিল এ রূপ লুকাইয়া? কোন্ পথ দিয়া এলে? ভাইদের কাছে আশার সংবাদ দিলাম; এখন যাহাতে তাঁহারা এই আনন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহাই কর। কোন্ পথ ধরিয়া শুষ্ক বালুকার মধ্য দিয়া, কোন্ পাহাড়ের ধার দিয়া, এই ভক্তি-সরোবর তীরে আসিলাম, দিক্ নির্ণয় করিয়া আসি নাই; গ্রামের পরিচয় লই নাই। তাই কাহাকেও বলিতে পারিতেছি না, এই পথে চল, ভক্তি হইবে; মৃদঙ্গ বাজাও, কি ঐ পথ ধর, নৃত্য করিতে পারিবে। কিছুই স্মরণ নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই। কেবল স্মরণ আছে, এক সময়ে ছিল না, এখন হইয়াছে। এক সময়ে তোমায় মা বলিতে পারিতাম না, এখন বলি, এমন মা কোথায় তুমি লুকাইয়াছিলে? মা, তোমার ব্রাহ্মদের যদি কেহ অসুখী থাকেন, সে এই জন্য—আমার মা যে তুমি, তোমাকে দেখেন নাই। তোমাকে দেখিলে দুঃখের যন্ত্রণা শেষ হবে। কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন, তাঁকে আমি আমার সখা বলি, আলিঙ্গন করি; তিনি আমার বন্ধু হন; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মা, এমন বন্ধু কাছে আনিয়া দাও। ব্রহ্ম ব্রহ্ম

করিয়া ভাগ করিলে কি হইবে? এখন তিন জনে মিলে না; পাঁচ জনে মিল হয় না। এমন মাকে যদি সকলে গ্রহণ করেন, গভীর প্রেমের মিলন হইবে। আর সম্প্রদায়-ভেদ, বর্ণভেদ থাকিবে না। এক মাকে দেখিলে কখনই বিবাদ হবে না; কখনই বিচ্ছেদ হবে না। আমি যাঁকে মা বলি, আর একজন তাঁকে মা বলেন না; আমি যাঁকে পরিত্রাতা বলি, আর একজন তাঁর নিকট পরিত্রাণ অন্বেষণ করেন না; এই জন্য এত বিবাদ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা। হরি হে! তুমি কখনও বিবাদ কর না। নৃত্যকারীদের ভিতর বিবাদ হয় না। মা থাকিতে কি বিবাদ হয়? করুণাময়ী, সে রাজ্যে কি বিবাদ হয়, যে রাজ্যে নৃত্য? কবে সে নৃত্যের দিন আসিবে? আশার কথা বলিলাম; বন্ধুগণ শুনিয়া সাধন করিবেন কি না, বলিতে পারি না। যত দিন না, মা, তোমার দেখা হয়, তত দিন চার, ছয়, দশ সম্প্রদায় হবেই হবে। কিন্তু জানি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন দিন আসিবে, যে দিন আর সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। কঠোর চিন্তা; ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। গতিহীনকে দয়া করিয়া এই বর দিবে না কি, যে কটী ভাই ভগ্নী নববিধানে আমরা তোমার পূজা করিতে উদ্যোগ করিয়াছি, মা আনন্দময়ি, আমরা যেন তোমারই পূজা করি, আর কাহারও না। আমি শুকনো পাতা কুড়ায়ে মরিতাম, আমার কি হইল! আহা! মা! ভক্তিতে মাতিলাম। খুব মাতাও; ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্‌মল্‌ করিতেছে দেখিয়া মরিব। পৌত্তলিকতা যাইতেছে, কি ব্রহ্মজ্ঞানীর দল বাড়িতেছে, এ দেখিয়া তত সুখ হয় না। "ঐ মাকে ডাকৃছে" এই কথা শুনিলে বড় সুখ হয়। আশা হয়, মাকে ডাকিয়া নবনৃত্যে

সকলে যোগ দিবে। আমরা কটী ভাই কি ছিলাম, কি হইলাম! লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিলাম; চঞ্চলা ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি, জঙ্গুলে ভক্তি, মাতানে ভক্তি আজ হইয়াছে। কাল কি হবে, তা জানি না। যেমন নৃত্য, তেমনই নাটক। পরে কি হবে, কেহই বলিতে পারে না। মা, একজনের দিকে সকলের দৃষ্টি হোক। পাঁচটী হরি চাই্‌ না। মতের হাজার ঈশ্বর, চল্লিশ হাজার ব্রহ্ম পূজা করিলে জগতের সুখ হবে না। একটী জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক। দয়াসিন্ধু, যেন আমরা প্রগল্‌ভা ভক্তিতে নাচিয়া নাচিয়া প্রমত্ত হই; একবার, অনাথনাথ, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

অষ্টম অধ্যায়।

লজ্জা ও ভয়।

রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

যদি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলাম, তবে জীবনের পরস্পর বিরোধী ভাবের কথাও বলা উচিত। এ জীবনে কি অভাব ছিল, জানাইলাম ; সে অভাব তিরোহিত হইল হরিপ্রসাদে, তাহাও শুনিলে। এই জীবনে দুইটী ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ কর। সেই বিরোধের সামঞ্জস্য শান্তি যথা সময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি জানিবে। এই জীবনে লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়া অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে। যেমন অন্যান্য রিপু, তেমনই লজ্জা ও ভয় উপদ্রব করিতেছে, এখনও সে উপদ্রব চলিয়া যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া, আদর করিয়া, লজ্জাকে ভয়কে প্রভু বলিয়া স্বীকার করি নাই। সাধু সজ্জনদিগের শত্রু লজ্জা ও ভয়। যেমন সকল পাশ ছিন্ন হয়, তেমনই এ পাশও ছিন্ন হয়। সাধন অভাবে হউক, অথবা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃই হউক, এখনও লজ্জা ও লোকভয় আছে। চেষ্টা করিলেও এ দুই ছাড়িতে পারি না। পদে পদে এই দুয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহাদের অধিকারে পড়িয়া আছি মনে হয়। লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্ম্মভূমি হইতে আমার লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন। ক্রমে ধর্ম্মপ্রতাপ যত বিস্তার করিলেন, বিবেক যতই প্রবল হইল, উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা

হরিভক্তি যতই বৃদ্ধি হইল, বিশ্বাস তেজ ততই বাড়িল; মনে হইল, ধর্ম্মরাজ্যে এমন দল নাই, যাহাকে ভয় করিতে পারি। ঈশ্বরপ্রসাদে জীবনের প্রাতঃকালেই বুঝিলাম, মানুষ অসার।

যে পরিমাণে বিশ্বাস বাড়িল, ধর্ম্মসম্বন্ধে লজ্জা ভয় সেই পরিমাণে কমিল। জীবনে এখনও লজ্জা ভয় আছে, কিন্তু তাহা পৃথিবীর ভূমিতে। যেখানে ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাই না, কর্ত্তব্যের হুকুম অনুভব করিতে পারি না, সেইখানে পুরাতন দুই প্রভু জীবনকে আপনাদের কাছে টানিয়া লইয়া যায়। সেরূপ স্থলে পাড়লে সমস্ত মুখের ভাব ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়; লোকসমাজে যাইতে বা কথা কহিতে লজ্জা বোধ হয়, ভয় হয়। এই মস্তক অনেক সময়ে সাহসে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহাই আবার সামান্য সামান্য মনুষ্যের কাছে নত হইয়া থাকে। বুঝি স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য, লাজুক স্বভাব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। যতবার লজ্জা ভয় দেখা দেয়, ততবারই মনে মনে কষ্ট হয়। ভয় হয় কাদের কাছে? রাস্তার মুটে, হান, মূর্খ যাহাদিগকে বলে, তাদের কাছেও ভয় হয়। বড় বড় বিদ্বান দেখিলে দলে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না; মন বলে, এত বড় দরবারে বিদ্বজ্জনেরা সম্মান পাইতেছেন, এমন স্থলে তুমি আসিতে পার না। জ্ঞানের বিক্রম এখানে। অন্ধকার এ স্থলে আসিবে না। এরূপ কোন ভিতরে আদেশ শুনি না; কিন্তু স্বভাব এমনই হইয়াছে যে, বিদ্বানের সভাতে পশ্চাতে থাকিতে আপনা আপনি ইচ্ছা করে। ধনাঢ্য যাঁহারা, লোকসমাজে খুব আদর পাইয়াছেন যাঁহারা, সম্পদের শিখরে বাস করেন যাঁহারা, তাঁহাদের দলের মধ্যে পড়িলেও ঠিক এইরূপ হয়। ধন মানের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দেখি যেখানে, সেখানে

স্বভাব আপনা আপনি সঙ্কুচিত হয়। এ সকল লোকদের কাছে দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না।

ধনী, মানী ও বিদ্বান্ এই তিন প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না; সহজে যাইতে চায় না। কর্ত্তব্য বলে, যাও; তাই যাই। কর্ত্তব্য বলে, বক্তৃতা কর; করি। ধর্ম্ম আদেশ করেন, তাই করিতে পারি। সে আদেশ যেখানে শুনি না, সেখানে কত আলোচনা করি, হাত অবশ হয়, পা নিস্তেজ হয়, চক্ষু আপনাকে আপনি বন্ধ করে। ঐরূপ দলের মধ্যে পড়িলে বোধ হয়, যেন এ দলে থাকিবার জন্য আমি হই নাই। এ কোথায় আসিলাম? কথা কহিতে গেলে মনে হয়, যেন ব্যাকরণের ভুল হইবে। শক্তি নাই, যাই কিরূপে? শরীরের কান্তি চলিয়া যায়, মুখ মলিন হয়, মস্তক হেঁট হয়। কেবল মনে হয়, কখন সভা শেষ হইবে; কখন গরিব বন্ধুদের কাছে যাইব; কখন আপনার পরিচিত দলে গিয়া মিশিব; কখন নিজগৃহে যাইয়া স্বভাবের স্বচ্ছন্দতা পাইব। লজ্জা কষ্ট দেয়। ভাবি, এরাও মানুষ, আমিও মানুষ; যদি ভুল হইল, ধন মান বিদ্যা আছে বলিয়া কি ক্ষমা করিবেন না? প্রাণ-বধ করিতে কি পারেন? অপমান কি করিবেন? গলায় হাত দিয়া কেহ কি তাড়াইয়া দিবেন? কেহ হয় ত তাড়াইয়া দিতেও পারেন। যদি বিদ্বানেরা বলে, তোমার পড়া শুনা তেমন হয় নাই, বিদ্বান্ সহবাসের তুমি উপযুক্ত নও; তুমি ধর্ম্মের উপদেশ দিতে পার, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুর আদর নাই, সেখানে আসিতে তোমার অধিকার নাই। এমন সকল স্থানে যাই নাই, অথবা কম গিয়াছি, তাহা নয়। পাঁচ বার গিয়াছি, পাঁচ বার সম্ভ্রম পাইয়াছি;

এবার হয় ত ভুল হইবে। বড় লজ্জা, ভারি ভয়। এত ভয়, যেন জীবন সংশয় বোধ হয়।

যদি লোক সঙ্গে না থাকে, একাকী বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে সাহস হয় না। একলা দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হব, এরূপ চিন্তা উচিত মনে হয় না। কোন কাজ করিতে গেলে পাঁচ জনের সঙ্গে করিতে চাই। কোথাও যাইতে হইলে দশ জনের সঙ্গে যাইতে চাই। সংসারে একাকী যেও না, ধনী মানীদের দলে একলা যেও না; কে এই কথা বলে? কে বলে?—ব্রহ্মবাণী? না, স্বভাব বলে। স্বভাব বলে, এরূপ প্রকৃতির লোক একাকী কোথাও যাইবে না; একাকী কোথাও যাওয়া এ প্রকার লোকের উচিত নয়। স্বভাব ত ইহা চায় না; যেখানে আপনার লোক, সেইখানেই থাকিতে চায়। বিদেশে কি স্বদেশে একাকী পড়িলে, আপনাকে অসহায় নিরাশ্রয় মনে হয়। বন্ধু বান্ধবদের অবস্থা দেখিয়াছি, কত স্থানে একাকী যান, অন্ধকারের মধ্যেও গমন করেন; কিন্তু এই ব্যক্তি ধর্ম্মসাহস এত পাইয়াও, কোন কোন বিপদের মধ্যে পড়িলে ভয় করে, একাকী যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে বিশ্বাস করে, তার কি ভয়? এখানে যে পৃথিবীর শূন্য ভূমি, এ সকল স্থানে ব্যাঘ্রের সম্মুখে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ভীত হইতে হয়। এখানে যে আক্রমণকারী শত্রু চারিদিকে। মন তাই ভীত। যেখানকার বিষয়ে ধর্ম্মকথা নাই, ধর্ম্মসংস্রব নাই, সেইখানেই লজ্জা, সেইখানেই ভয়। উপাসনার সহিত যেখানকার সংস্রব আছে, সেখানে দশগুণ অধিক ভয়ের কারণ থাকিলেও, ভয় চলিয়া যায়; কিন্তু অন্যত্র "দূর হও লজ্জা" "দূর হও ভয়" বলিলেও যায় না।

পাঁচ জন লোক আসিতেছেন দেখিলেই পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছেন, বলিতে পারি না; চক্ষুর দিকে তাকাইতেও পারি না। তাঁরা যদি প্রথমে কথা না বলেন, আরও বিপদ হয়। ইচ্ছা হয়, এখনই পলাই; পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া থাকি। বিষয়ী বড় বড় লোক কত আসেন; ভাবি, এখান হইতে কি চলিয়া যাইতে পারি না? ভাইয়েরা বাড়ীতে আসিলেও অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কেহ কেহ অহঙ্কারী বলিয়া চলিয়া যায়; ধর্ম্ম হইয়াছে বলিয়া অভিমানে স্ফীত বলে; কটূক্তি করিতেও বিলম্ব করে না। যুক্তি দিলে বুঝি, অন্যায় হইতেছে; কিন্তু স্বভাব ধৌত করিলেও কিছু হয় না। এ স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য বোধ হয় যাইবে না। কিছু যদি কমে, একেবারে যাইবে বোধ হয় না। সময়ে সময়ে মনে হয়, গেলেই বা কি হইবে? বিষয়ীদের সঙ্গে ত থাকিতে পারিব না; যোগ ত হইবে না। ধর্ম্মসম্বন্ধ ভিন্ন অনন্ত সম্বন্ধ চাই না। গর্ব্বিত, দাম্ভিক, অহঙ্কারী নাম পাইয়া বসিয়া আছি। কি করিব? চেহারা যদি দেখ, দশ জনের মধ্যে যখন বসিয়া আছি, বুঝিবে, এ লোকের পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। বাজারের নাম হইলেই পলাইতে ইচ্ছা হয়। সংসার আমার মুখের দিকে তাকাইলে গালের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাকাও সংসার, আর ভিতরের রং বদলাইয়া যাইবে। পাঁচটী কথা বল, আর আমি নাই; কেবল শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইবে; শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবে, বুঝি এমন হলে আমি মারা যাইব। এমন অবস্থায়ও পড়িয়াছি যখন মনে হইয়াছে, উপস্থিত লোকেরা চলিয়া যায় না কেন? বলিতেও পারি না। সময়ে সময়ে

লোকে কত শত কথাও বলিয়াছে, আমি বালকের ন্যায় বসিয়া আছি।

পাঁচজন সাহেব বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে সঙ্গী থাকিলে ভাল হয়। লজ্জা ও ভয় যার এত, সে পৃথিবীর পথে একাকী বেড়াইবে না। এই জন্য বিশ্বস্ত বন্ধুর সর্ব্বদা প্রয়োজন; ধাত্রীরূপে কাছে থাকা প্রয়োজনীয়। এ ব্যক্তি খুব বুঝিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যে ঈশ্বর-ক্রোড়ে এবং সংসারে ধাত্রী বা বন্ধুর ক্রোড়ে না থাকিলে চলিবে না। আমার হয়ে সংসারে বন্ধু কথা কন, এমনই ইচ্ছা হয়। এক দিকে এই লজ্জা, আর এই ভয়; কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন। সেখানে মনুষ্যকে কোন ভয় করি না। কখনও কোন মনুষ্যের খাতির রাখি নাই; রাখিতে পারিবও না। আমার ধর্ম্ম যেখানে নির্ল্লজ্জ হইতে বলিতেছেন, সেখানে নৃত্য করিতে পারি; পৃথিবীতে করিতে গেলে, বোধ হয়, দশ বৎসরের চেষ্টাতেও পারিব না। যেখানে ঈশ্বর, সেখানে এমনই নাচিব যে, দশ জনে হীন ছোট লোক বলিবে। বলুক, তার জন্য প্রস্তুত। অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে খুব নির্ল্লজ্জতা প্রকাশ পাইয়াছে। একটীর পর একটী করিয়া অনেক করা হইয়াছে; রাস্তায়, ঘাটে, সকল স্থানেই করা হইয়াছে। মা যখন বলিয়াছেন, তখন লজ্জা ভয় কি? এখানে লজ্জা ভয়কে শত্রু বলিয়া খণ্ড খণ্ড করা উচিত। দশ জনের কাছে বিরুদ্ধ-সত্য-মত প্রচার করিতে হইলে নির্ল্লজ্জ হইব, ভয় ত্যাগ করিব। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজা বড়লোক হইলেও সত্য প্রচার করিব। কিন্তু অন্যত্র কেন ভয় হয়, জানি না। এক স্থানে সিংহ যে, অন্য স্থানে মেষশিশু সে। সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে ভয়ানক

লজ্জা, অত্যন্ত ভয়; সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে ভয়ানক নির্লজ্জতা, অতিশয় সাহস।

হে দীনবন্ধু, হে অপার করুণাসিন্ধু, তুমি যাহাকে লইয়া খেলা কর, তার চরিত্র অন্যে বুঝিতে পারে না; সে আপনিও বুঝিতে পারে না। আমি লজ্জা ভয়ের মধ্যে পড়িয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখি। আমি পৃথিবীকে কেন এত ভয় করি? কত লোকে যে নিন্দা করিতেছে, দোষারোপ করিতেছে। এ লোকটা যে লোকের কাছে ভয়ানক অহঙ্কারী বলিয়া পরিগণিত হইল। তোমার আশ্রিতের মান সম্ভ্রম কি রাখ্‌বে না? তোমাকে যে বিশ্বাস করে, সে অহঙ্কারী হইল? তুমি জানিতেছ, অহঙ্কার অভিমান নয়; লজ্জাশীলতা। পৃথিবীর লোকের মধ্যে পড়িয়া আমি কি নাকাল হই, জান। কি যে জড়ভাব হৃদয়ে হয়, তুমি জান। সে অবস্থা বর্ণনাতীত! কিছুতে কথা কহিতে পারি না; লজ্জা ভয় আসিয়া উৎপীড়ন করে। এ জীবনে এ দুটী দুর্ব্বলতা আছে, জানিলেন ভাই বন্ধু। আমি পক্ষসমর্থন করিতে আসি নাই। আমাকে ভাল বলে, বল্‌ক; মন্দ বলে, বলুক। সে দিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনবেদ বল্‌ছি না। আমার ভয় আছে, লজ্জা আছে। যারা হরিভক্ত, তোমাতে আসক্ত, তাদের কাছে লজ্জা হয় না, একটুও ভয় হয় না। যদি হয়, সেখানে তত পরিচয় হয় নাই বলিয়া। আপনার লোকের কাছে আমি সাহসী সিংহের মত। তাদের সম্মুখে মন খুল্‌তে ইচ্ছা হয়। যাই বাহিরের লোক আসে, অমনই জিহ্বা জড়ের মতন হয়। আমার চরিত্র, মা, তুমি জান; আমি সুখ্যাতি প্রশংসা চাই না। এর জন্য আমার অনিষ্ট হচ্চে, বিশ্বাস করি না। পৃথিবী

ভয়ানক স্থান; পৃথিবীর বাজারে দোকানে আমি কিরূপে কার্য্য করিব? কর্ত্তব্য না হলে সে সব স্থানে যাই না। সংসারের আগুনে আমাকে ফেলো না। তোমার পাদপদ্ম লাগে ভাল, আর গুটিকতক তোমার অনুগত বন্ধু বান্ধব লাগে ভাল। প্রচারক করিয়াছ, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। বলিদানের ছাগলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আমি যেখানে সেখানে গমন করি। এ লোক দক্ষ নয়, নিপুণ নয়, তুমি জান। প্রতাপ তোমারই, মহিমা তোমারই। এমন লাজুক লোককে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, ধর্ম্মে সাহসী করিয়াছ। স্বভাব যার লাজুক, ভীত, সেও গৌরবে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতেছে। মা! লজ্জাহীনকে লজ্জা দিতে পার; আর যার লজ্জা আছে, তার লজ্জা দূর করিতে পার; পৃথিবীর বলীকে তুমি দুর্ব্বল করিতে পার; দুর্ব্বলকে বলী করিয়া তার হুঙ্কারে অপরকে ভীত করিতে পার। এ গরিবকে কি করিলে? লাজুকের ধর্ম্মে লজ্জা গেল, এ যে এক আশ্চর্য্য কথা। তাই হাত যোড় করিয়া মিনতি করি, খুব সাহস সকলের বাড়ুক। ধর্ম্মের খাতিরে যেন লজ্জা না হয়। ধর্ম্মের জন্য বেহায়া হওয়া চাই। সময় আসিয়াছে, পথে পথে প্রগল্ভা ভক্তির খাতিরে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জ হইয়া বেড়াইব। আজ কাল যে শুভ সময় আসিয়াছে, এখন যদি ভয় করি, নববিধান মাটি হইবে। নাচিতে বসিয়াছি, এখন মাথার কাপড় টানিব না। লজ্জার খাতিরে আদেশ পালন করিতে পারিব না। একেবারে মান অপমানের মধ্যে স্থির থাকিয়া শ্রীপাদপদ্ম সাধন করিব। লোকে নির্লজ্জ বলিবে, হীন বলিয়া ঘৃণা করিবে; যে সুখ পাচ্ছি, তাহাতে মানুষের মুখ চেয়ে ভীত হব, মনে হয় না। পৃথিবীতে বালকের ন্যায়

অসহায় থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে সিংহের ন্যায় হইব। হে মাতঃ, হে জননি! ধর্ম্মরাজ্যে মুকুট পরাইয়া দাও। থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ, তোমার নামকে জয়ী করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, ভক্তিতে নির্ল্লজ্জ হব; বিশ্বাসে সাহসী হব। অন্যত্র লজ্জা ভয়ের জন্য তত ভাবি না। করুণাময়ি, করুণা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভক্তিতে বিশ্বাসে নির্ল্লজ্জ ও সাহসী হইয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। মা, কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

নবম অধ্যায়।

যোগের সঞ্চার।

রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপার্জ্জিত বস্তু, যোগও তদ্রূপ। ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ কালে যোগী ছিলাম না; যোগের নাম শুনিতাম না; যোগ কথা জানিতাম না; যোগের লক্ষণ নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না; যোগের পথে কখনও যে চলিতে হইবে, এ চিন্তা করি নাই। খুব পুণ্যবান্ হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিব, ইহাই ধর্ম্ম জানিতাম; ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতাম। যোগী হইব কেন? যোগী কে? এ সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতাম না; ওদিকেই যাইতাম না। যোগের কথা তখন ব্রাহ্মসমাজে উঠে নাই; যোগসাধন ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। দশ পনের বৎসর সত্য, প্রেম, বৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলাম; ইহাতেই অনেক সময় অতিবাহিত হইল। ঈশ্বরপ্রসাদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার হইল। ক্রমে ভক্তি প্রমত্ততায় পরিণত হইল। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকিবে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। দুই থাকিবে কেন? হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটা তেমনই যোগীর নয়ন হইবে। ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতি

আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস জন্মিল। মনে হইল, ভক্তি, যোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোন কার্য্যেরই নয়।

ভক্তির রং দেখাইবা মাত্র শত সহস্র লোক সেই রঙে অনুরঞ্জিত হইল; ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির রং বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রং যখন আমার হইল, তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়া, সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবে গদগদ হইলেন। ভক্তি তাঁহাদের খুব হইল। যোগ তত শীঘ্র হইল না। যোগ কিছু শক্ত, সাধন শক্ত, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত; আজ পর্য্যন্ত ইহাকে দুর্ল্লভ বলা যায়। যাঁরা এই দুর্ল্লভ যোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের হইলে আর দশ জনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় দুই পাঁচটী যোগীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমি যোগের পক্ষপাতী হইলাম, কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণে যোগের পক্ষপাতী হইল না। যখন আমার জীবনে অভাব অনুভূত হইল, বুঝিলাম, যদি যোগ না থাকে, বিশ্বাস নিষ্ফল, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য কোন কার্য্যেরই নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে এক না হইতে পারিলে মানবজন্মের সফলতা হইবে না। এই সত্য বুঝিয়া যোগের পথে পথিক হইলাম। শাস্ত্র পড়িয়া কি এ পথে আসিলাম? না। পুস্তক পড়িয়া? লোকের উপদেশ শুনিয়া? না, কিছুতেই নয়। কোন পুস্তকে আমি তখন যোগের কথা পাই নাই।

মৃদঙ্গের আকারে ভক্তির শাস্ত্র যখন আমার নিকট আসিল, তখন মনুষ্যের কথায় ভক্তিতে আমি দীক্ষিত হই নাই। ঈশ্বরের প্রসাদবারি ভক্তির আকারে আসিল। সেইরূপ কোথা হইতে এক বায়ু প্রবাহিত

হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল। এক দিকের বায়ু ভক্তি দিল, আর এক দিকের বায়ু যোগ আনিল। এইরূপে স্বর্গের দুই প্রান্ত হইতে দুইটী বায়ু প্রবাহিত হইয়া, দুই ধন আনিয়া উপস্থিত করিল। হস্তগত হইলে পর বুঝিতে পারিলাম, একে বলে ভক্তি, আর একে বলে যোগ। ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে; যোগ ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি করে। একটী ভাই, আর একটী ভগিনী। একজন পরিচর্য্যা করিয়া ভক্তিকে বিশ্বাসভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল, আর একজন পরিচারিকা হইয়া যোগকে সরস করিল। যোগ হয় ত অদ্বৈতবাদে লইয়া ফেলিত; ভক্তি হয় ত কুসংস্কার উৎপন্ন করিত। কিন্তু যোগের পাহাড়ে ভক্তির বাগান হইল। সে বাগান স্বপ্নের বাগান নয়, কল্পনার বাগান নয়, কেন না সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগে যোগে মহাযোগ হইল; মহাযোগের ফল হইল। এদেশে আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলাম; কেন না অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন; ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতিয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিকই বাঁধিলাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।

যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল; ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছলিত হইল। এক চক্ষু যোগের, আর এক চক্ষু ভক্তির। ঈশ্বর আমাকে সৌভাগ্যশালী করিলেন। দুই চক্ষু একেবারে উন্মীলিত করিয়া এক চক্ষে যোগেশ্বরকে দেখিলাম, আর এক চক্ষে ভক্তির ঈশ্বরকে দর্শন করিলাম। কাঠের ভিতরে, ফলের ভিতরে, ফুলের ভিতরে, চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে, বায়ু অগ্নির মধ্যে, জলের মধ্যে সার ব্রহ্ম বস্তুকে দেখিলাম; আর এক চক্ষুতে কাঠ আগুনের ভিতরে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই যে

হরি, অতিশয় সুন্দর ঠাকুর, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। যাঁর আরম্ভ সত্য, তিনিই সুন্দর। সত্য শিব সুন্দর যিনি, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ হইত, এই দর্শনে জীবনে পবিত্রতার সঞ্চার হইত। দুই একত্র থাকাতে অনেক পাপ অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতাম। আগে যেখানে কাঠ মৃত্তিকা দেখিতাম, এখন আর শুদ্ধ তাহা দেখি না। অধিক সাধন করি নাই; চক্ষু খুলিয়া সাধন করিলাম; তাকাইলাম চারিদিকে; দেখিলাম, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন। জলের ভিতরে ব্রহ্ম; পর্ব্বত মধ্যে পাহাড়ে ব্রহ্ম। জল দেখিলাম, স্পষ্ট ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, দেখিতে পাই। ফুলের পাপড়ির মধ্যে ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; ফুলে ফলে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝোপের দিকে যাই তাকাইলাম, গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম; আবার বলিলেন, "আয় কাছে আয়।" খুব নিকটস্থ হইলাম; বলিলাম, ব্রহ্ম পাইয়াছি; যোগ হইল।

যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না; আকাশ আর আকাশ থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে। সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এক শক্তি টন্ টন্ করিতেছে, এই অনুভব হইবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা আকাশময় বিস্তৃত রহিয়াছে; আনন্দ প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া চারিদিক শীতল করিতেছে, জীবকে শান্তি দিতেছে। এ সকল ভাব জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা হয় না। এ কি হুকুমে হয়? সাধনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় হয়। এটী আমার পক্ষে আগে ছিল না। উপাসনা,

প্রার্থনা করিতাম; পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত, পাপ-শৃঙ্খল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত, পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইতাম; যোগ সাধন করিতাম না। জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় চারিদিকে ব্রহ্মাগ্নি ফট্ ফট্ করিতেছে, হু হু করিয়া বাতাসের ন্যায় ব্রহ্ম আসিয়া গায়ে লাগিতেছেন, এ সকল কথনও মনে হইত না; ক্রমে হইল। হইল যখন, তখন আর ছাড়িব কেন? এই যে নিকটে ব্রহ্ম; আরও নিকটে যাই। এক হাত দূরে গিয়া দেখিতে হয়,---নিকটে বসিয়া আছি, দেখিব। এইরূপ করিয়া ক্রমে যোগ গাঢ়তর হইল। যোগেরও পরিমাণ আছে। পাঁচ মিনিট যোগ, পলকে যোগ, ঘণ্টায় যোগ, যত বার চাই তত বার যোগ। এই যোগের জন্য গুরু বিনা, উপদেশ বিনা, চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছাড়া হইবে না; চক্ষু যত দিন থাকিবে, ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে; যত শব্দ শুনিব, তার মধ্যে ব্রহ্মের শব্দ শুনিব। তাহাই হইল। এখন মনে হয়, আগে অযোগী ছিলাম কিরূপে? ব্রহ্মবিদ্যুৎ চড়াৎ করিয়া সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে; ভিতরে চিক্‌মিক্ করিতেছে। ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মকে দেখা যায়। চক্‌মকি ঠুকিলে যেমন আগুন বাহির হয়, তেমনই পলকের মধ্যে শরীরে, হাতে, অঙ্গুলিতে, রসনায় ব্রহ্ম প্রকাশিত হন; ব্রহ্ম এস, এই হস্তের অঙ্গুলিতে দেখা দাও, অমনই ব্রহ্ম-জ্যোতি দেখা গেল। এই এখানে এস, আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া কতরূপে ব্রহ্মকে দেখিলাম, ব্রহ্ম উত্তীর্ণ হইয়া দেখা দিলেন।

এই যোগ ভক্তি ছাড়া কি হইতে পারে? ভক্তিপূর্ণ যোগ, মিষ্ট যোগ; ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। একতারা লইয়া সাধন করিলাম, যোগে মগ্ন হইয়া গান করিলাম, সেই গানের ভিতরে ভক্তি প্রবল

হইয়া সুখ দিল। সুখে হরিপাদপদ্ম ধরিলাম। বুঝিলাম, কেবল ভক্তির ব্রহ্ম নয়, যোগের ব্রহ্ম, ভক্তির ব্রহ্ম। একেবারে ভক্তি, যোগ মিলাইয়া সাধন করিলাম। জীবনযন্ত্রে এক সুর বাজিতে লাগিল। এটী ভক্তির সুর, যোগেরও সুর। এই দুই এক হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। দেখ, কি ছিলাম, কি হইলাম! পর্ব্বতে গিয়া গুরু অন্বেষণ করি নাই, পুস্তক এ জন্য পড়ি নাই, নিঃশ্বাস অবরোধ করি নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যৌবনে, যোগী হব, ভক্ত হব। ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল; যে অল্প প্রেমের ভাব জীবনে ছিল, তাহাই প্রগল্‌ভা ভক্তির আকার ধরিল। আগে শুষ্ক ছিলাম। আগে কর্ম্ম আর নানা অনুষ্ঠান করিয়া দিন কাটাইতাম, ক্রমে যোগতত্ত্ব শিখিলাম। আগে চক্ষু বন্ধ করিলে অন্ধকার দেখিতাম, ক্রমে বুঝিলাম, নির্জনেও সজন হওয়া যায়; অন্ধকারেও আলো দেখা যায়। কাঠের ভিতর হইতে ব্রহ্মকে বাহির করা যায়, জলে, আকাশে তাঁহাকে দেখা যায়। এস বলিয়া ডাকিয়া প্রার্থনা করিবা মাত্র ব্রহ্ম দেখা দিবেন।

শত শত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা হয় ত আমার পূর্ব্বকার কষ্টের ন্যায় কষ্ট পাইতেছেন। এমন হয় ত অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন, জলে আগুনে কেমন করিয়া ব্রহ্মকে দেখিব? এ যে অদ্বৈতবাদ হল। ব্রহ্মকে ইয়ার ভাবিয়া হাফেজের ন্যায়—কি হে, এত কাছে রহিয়াছ, ফুলের ভিতরে রহিয়াছ, বুকের ভিতর রহিয়াছ—এরূপ কথা বলা যায়? প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে। এখন আমি আছি কি না, এ বিষয়ে পাঁচ জনের সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরের

দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে। একটী অস্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করা যায় না। তোমরাও যোগ শিখিবে। আশার সংবাদ দিলাম। ব্রহ্মকে স্পষ্ট বস্তুর ন্যায় দেখিবে। বইএর ঈশ্বরকে আমরা ধরি না; চক্ষুতে দেখি, তবে মানি। মেনো না ভাই বন্ধু, কল্পনার ঈশ্বরকে, শূন্যের ঈশ্বরকে মেনো না। যোগী হও, ভক্ত হও; অভাব মোচন হইবে। আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, এখন যোগের পাহাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক, না কর্ম্ম অধিক? বিবেকের প্রভাব অধিক, না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ করা অধিক? ষোল আনা যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে ষোল আনা যোগ আছে। দুই আনা যদি যোগ থাকে, তবে দুই আনা কর্ম্মও আছে। ভক্ত হইয়াছি বলিয়া যোগসাধনে আলস্য করিতে পারি না। এ জীবনে যোগ ভক্তি একত্র হইল। এত নীচ ব্রাহ্ম যোগের শিখরে ভক্তির বাগানে বেড়াইতেছে। হে ব্রাহ্মবন্ধুগণ, এত নিকৃষ্ট জীবন তোমাদের নয়। আমি নীচ হইয়া এত ধন পাইলাম, তোমরা ধনাঢ্য হইয়া যোগ ভক্তির আনন্দ লাভ করিবে, তাহা বিচিত্র নয়। আশা দিতেছি, উৎসাহ দিতেছি; ব্রহ্মপাদপদ্ম ধরিয়া যোগী হও, ভক্ত হও।

হে দীনবন্ধু, হে যোগেশ্বর, এ জীবনে দেখিলাম, অভাব থাকে বটে, কিন্তু মোচন হইয়া যায়। কে জানিত, ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া, ইংরাজী মত শিখিয়া যোগী হইতে হইবে। কিন্তু, নাথ, তোমার পথে আসিয়া যোগী হইতে হইল। আমি যে স্বপ্নেও যোগ ভাবিতাম না; যোগের কথা জানিতাম না। যখন আসিলাম ব্রাহ্মসমাজে, কে

ধাক্কা দিয়া বলিল, "যা, হরির সঙ্গে যোগ সাধন কর।" হে পরম পিতা, বারবার এইরূপ ধাক্কা খাইয়া, সংসার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, কি চমৎকার রাজ্য! যেমন সহর ঘর বাড়ী দেখি বাহিরে, তেমনই অন্তরেও দেখিলাম। এখানেও ত খুব আনন্দ। তবে কেন মানুষ যোগী হয় না? যদি লোকের উপদেশ শুনিতাম, হয় ত নিশ্বাস অবরোধ করিতে বলিত, কৃত্রিম যোগপথ ধরিতাম। কিন্তু, মা, তুমি নাকি সুখী করিবে, তাই ভ্রম হইতে বাঁচাইলে। বাঁচিলাম; সহজে যোগের পথ ধরিলাম। নিশ্বাস-যোগ যেমন সহজ, তোমায় দেখা তেমনই, বুঝিলাম। প্রকাণ্ড পর্ব্বতে, অসীম সুবিস্তৃত আকাশ মধ্যে তোমাকে পদার্থের ন্যায় স্পষ্ট দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বলিলাম, হে চক্ষু, ব্রহ্মকে না দেখিয়া নাস্তিক হইও না; কর্ণ, "আমি আছি, আমি আছি" এ শব্দ শুনিও, ব্রহ্মের নানা বিচিত্র কথা শুনিও। এইরূপ দেখিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছি। কদিন বা সাধন করিলাম? শীঘ্রই সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজী শিখিয়া একজন যুবক যোগী হইল, বিশ্বাস হয় না; কিন্তু দেখিলাম, সভ্যতার ভিতরে যোগ জন্মিল। প্রেম ভক্তির মধ্যে যোগ হইল। যে হরিকে দেখা যায়, ন্যায় শাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত করিলাম, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই হরিকে পরীক্ষা করিলাম। হরি, তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। আত্মন্, জয়ধ্বনি কর; রসনা, জয়ধ্বনি কর; আমার ব্রহ্ম পরীক্ষোত্তীর্ণ। গাছ আকাশ দেখিয়া দেখিয়া আস্তিক যে, সে হয় ত নাস্তিক হইবে; কিন্তু আমার ব্রহ্ম আমাকে বর দিলেন, "যত প্রকারে আমার পরীক্ষা করিবি কর্। আমি তোরই; তুই আমারই।

আমাকে তোর হাতে দিয়াছি, যাচাই কর, বড় বাজারে লইয়া যা, আগুনে ফেল্, জলে ফেলিয়া রাখ্, পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ্, পরীক্ষা কর্।" পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, হরি আমার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তখন বুঝিলাম, হরি, তুমি কখনই মিথ্যা নও। বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌চক্ করিতেছ; চড়াং চড়াং করিতেছ। ব্রহ্ম বস্তুকে কে দেখিয়াছে? হিমালয়, তুমি আমার ঐক্যের সাক্ষী হও; আকাশ, তুমি পুষ্প বর্ষণ কর। হে সত্য, হে জলন্ত ঈশ্বর! আমি তোমায় দেখিয়াছি; তুমি কথা কও, কথা কও। আমি নাস্তিকের ঈশ্বর মানি না। বাল্যকাল হইতে আমি তোমায় মানিতেছি। পর্ব্বত অপেক্ষাও তুমি সত্য, তোমাকে জড়াইয়া ধরা যায়। তোমাকে অগ্নির মত দেখা যায়। প্যাসিফিক্ মহাসাগর পার হওয়া যায়, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, আমি যোগী; আমি তোমাকে দেখিতেছি। এখন প্রাণ আমার তোমাতে ডুবিয়াছে। কথা কও; ধরা দাও প্রত্যেককে। নাস্তিকের ঈশ্বর, দূর হয়ে যা; কল্পনার ঈশ্বর, দূর হ; স্বপ্নের ঈশ্বর দূর হ; তোকে মানি না। কল্পনার ঈশ্বরকে ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে না। এস, আমার ঈশ্বর, তুমি এস। ভগবান্, এস, জলন্ত আগুন, এস। ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাক। পলকের মধ্যে ভারতের কোটী কোটী লোককে বিশ্বাসী কর। ভাই বন্ধুরা কাঁদিতেছেন, দেখা দাও। নিরাকার পূজা যদি ধরাইয়াছ, তবে শাস্ত্র দেখা দাও। দেখিয়া সকলে আস্তিক হইবেন। আমি আস্তিককে বড় করিব, আস্তিককে ব্রহ্মপুত্র বলিব। যিনি বলিবেন, এই যে আমার ঈশ্বর, তাঁকেই আমি সার্থক-জন্ম বলিব। কেমন সহজ ঈশ্বর-

দর্শন! এমন বিশ্বাস না হলে মজা কি? এমন যদি না হবে, তবে কি করিলাম কুড়ি বৎসর? কি ছার সে সাধন, যাহাতে 'এই ঈশ্বর' 'এই ঈশ্বর' করিয়া পড়া মুখস্থ করার মত ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মা বলিয়া সহজে তোমাকে ধরা যায়। ওহে গরিবের ধন! আমি যে তোমাকে সহজে পাইয়াছি। আমার যে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মধন এখন যে আমার ভাণ্ডারে, আমার পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে। রাজা অপেক্ষা আমি বড় হইলাম। জমীদার অপেক্ষা বড়। তোমার সন্তান হইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরাধিকারী হইলাম। যোগেতে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি। মাকড়সা যেমন জালের পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম আমার মধ্যে করিয়াছি। আমি ধন্য! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধন্য! এই কথা সকল যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারা ধন্য! ধন্য, হে ঈশ্বর! তুমি ধন্য! তুমি অযোগীকে যোগী করিতে পার। হে কৃপাসিন্ধু, এই আশীর্ব্বাদ কর, সচ্চিদানন্দকে বিশ্বাস করিয়া, যোগের সুফল এই জীবনেই যেন আস্বাদন করিতে পারি। জগজ্জননি, মুক্তিদায়িনি, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

দশম অধ্যায়।

আশ্চর্য্য গণিত।

রবিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১লা অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

আমার জীবনের গণিত অতীব আশ্চর্য্য। যে অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা জগৎ পরিচালিত, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি নাই। তাহার সঙ্গে আমার অঙ্কশাস্ত্রে বিরোধ দেখিতে পাই। মূল ত দুই বিবাদ ; অথচ আমার গণিত আছে, তাহার শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারা যায়, ভক্তদের বোঝানও যায় ; নিয়মাদি সকলই তাহার ঠিক আছে, সাধারণ মানবমণ্ডলী তাহা মানে না ; শতাব্দী যাইবে, তথাপি মানিবে না। যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি, সেখানকার রীতি পদ্ধতির এখানকার সহিত ঐক্য হয় না। যেমন এ অঞ্চলের লোকেরা এখানকার রীতি নীতির পক্ষপাতী, আমার দেশের লোকেরা সেইরূপ সেখানকার রীতি নীতির পক্ষপাতী। সকলেরই আপনার দেশের প্রতি, আপনার গৃহের প্রতি অনুরাগ আছে। কে না আপনার দেশকে মহিমান্বিত করিতে চায়? হে মানবজাতি, তোমরা এ দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার যদি ভাল করিয়া থাক, তবে যেমন তাহা পরকে বুঝাইতে চাও, সেইরূপ করিবার সমান উৎসাহ ও অধিকার লইতে আমাকে দাও। আমি আমাদের দেশের কথা বলি। আমাদের দেশকে আমি ছোট বলিব না। আমাদের দেশের লোকে যে শাস্ত্র মানেন, তাহা ছোট নয়, বরং বড়। অন্ততঃ বিশ্বাস কর, সেখানকার শাস্ত্রের কথা কিয়ৎক্ষণ শোনা ও আলোচনা করা উচিত।

সে যে অঙ্কশাস্ত্র, লোককে তাহা বিস্ময়াপন্ন করে। সাধারণ লোকে তাহার মধ্যে অসত্য দেখে। যাহারা সে সত্য সাধন করে, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল বলে। তথাপি মুখ থামিবে না, তেজের সহিত বলিব যে, অঙ্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্য্য; কেন না, তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতের অবশিষ্ট থাকে। এই সারতত্ত্ব ধরিয়া, এই নিয়ম অনুসারে ধর্ম্ম সাধন করা হইলে লাভই হয়, ক্ষতি হয় না। এইরূপে সাধন করাতেই বহু শত্রু সমক্ষেও জয়পতাকা নিখাত করা হইয়াছে। এই অঙ্কের উপর ধর্ম্মজীবন স্থাপিত; যে জয় হইয়াছে, তাহা ইহাতেই হইয়াছে। যেখানে পাঁচ আর তিনে আট বলিয়াছি, সেইখানেই হারিয়াছি। যেখানে বলিয়াছি, অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকি থাকে, সেইখানেই জিতিয়াছি। গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত বুঝিলাম, অমনই করিলাম। আকাশের দিকে প্রাচীর উঠিল, গৃহ নির্ম্মাণ হইল, ঘরে ছবি দেওয়া হইল, তার পর পত্তনভূমি নির্ম্মাণ করিলাম। সর্ব্বশেষে পত্তনভূমি প্রস্তুত করি। এ দেশের এই বিধি, এই শাস্ত্র।

যাহারা ভিত্তি পত্তন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করে, তাহাদিগকে আমরা নির্ব্বোধ বলি; জয়লাভ করিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যদি দেখি, কেহ বলিতেছে, কেমন করিয়া ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইবে, কিরূপে প্রাচীর উঠিবে, আগে যদি টাকা না হইল, কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, অমনই বুঝিয়া লই, ইহার জয় সম্ভব নয়। আমরা বলি, বাড়ী চাই ঈশ্বর? হাঁ। বুঝিলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চার-তলা বাড়ী হইল। বাড়ী নির্ম্মাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিয়া পরেও

ভাবিবে না। আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না; ভাবনা কখনই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিবে; ভাবিবে কেন? সন্তানের বিবাহ দিবে, পাঁচ শত টাকা চাই, পাঁচ হাজার টাকা চাই; পৃথিবীর মূর্খ ভাবে কোথায় টাকা, কেমন করিয়া টাকা আসিবে। বিবেচনার পর আলোচনা, আলোচনার পর বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করে। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল; বিবাহ আর হইল না। যার ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তার সকল বিষয়েই ভাবনা আসিল। আমাদের দেশে লোকে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কেবল আকাশের দিকে তাকায়; বলে, হরি, তোমার এই কন্যার কি বিবাহ দিতে হইবে? হাঁ, পাঁচই আশ্বিন দিন স্থির। বিবেক ও বৈরাগ্যের অস্ত্র লইয়া সাধক বাহির হইলেন। শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল; কোন বাধাই ঘটিল না। পাত্র ছিল না, টাকা ছিল না, এই অবস্থাতে সাধক কার্য্য সাধন করিলেন।

এইরূপ অবস্থায় পৃথিবীর লোকে ভাবে, কিরূপে হইবে? ঈশ্বর জানেন; হইবে। ভক্ত বলেন, ঈশ্বর যখন বলিয়াছেন, তখন হইবে। ভক্ত দেখিলেন, একটী পয়সা নাই; কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন, পাঁচ শত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎকৃষ্টরূপে খাওয়াইতে হইবে। ভক্ত উপাসনায় বসিলেন। এদিকে বিবাহের বাদ্যও প্রস্তুত, হাজার লোকের আয়োজন হইল। বিবাহ হইয়া গেল। কিরূপে হইল? হইবে কিরূপে, এ দেশের লোকে ভাবে না; হইল কিরূপে, ইহাই ভাবে। ঠিক যেখানে সাতটী টাকা চাই, দশ জন লোক চাই, ঠিক সময়ে তাহাই আসিল। যখন যাহা প্রয়োজন হইল, সকলই হইল। কোন্ সূত্রে কেমন করিয়া হইল, কে বলিবে? স্বর্গ জানে, মর্ত্ত্য বলিতে

পারে না! এই সব হইল। আবার গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করেন, কিরূপে হইল? সকলই এইরূপে হইল; এইরূপেই লোক আসিল।

যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে, এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে। সাধক অমনই বুঝিলেন, এ কার্য্য মন্দ কার্য্য; ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা গ্রাহ্য করিবে, পণ্ডিতেরা মানিবে, সাধারণ লোকে যশ কীর্ত্তন করিবে, অতএব এ কার্য্য করা হইবে না। মন বলিল, এই কার্য্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা গেল, এ একটু ভাল কার্য্য; ভাল ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে, পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা করিতে যাইব, কেহই শুনিতে আসিবে না; খুব বন্ধু আপনার লোক যারা, তারাও ছাড়িয়া যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে; যেই এরূপ দেখিলাম, মন বলিল, ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, অতএব এই কার্য্য করা উচিত। কেন না, পৃথিবীর যাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল।

লক্ষ লোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত গৃহস্থ বলেন, তিন জনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে। পৃথিবী বলে, এ কাজ পাঁচ সহস্র লোক ভিন্ন সমাহিত হইবে না; ভক্ত বলেন, পাঁচ জনের অধিক লোক যদি এ কাজে হয়, ইহা নষ্ট হইবে। অনেক টাকা চাই, অনেক প্রচারক চাই, অনেক উপদেষ্টা চাই, তবে প্রচার হইবে, পৃথিবীর এই কথা। ভক্ত বলেন, না, পাঁচ জন হইলেই

যথেষ্ট; বার জন একত্র যদি হয়, উচ্চসংখ্যা ভাবিবে; বার জন যা করে, বার লক্ষ তাহা করিতে পারে না। তের জন লোক করিতে গেলেই মন্দ হয়। যাহা পাঁচ শত লোকে না করিতে পারে, পাঁচ জনে তাহা করিতে পারে। আর পাঁচ জনের কার্য্যে ছয় জন লোক প্রবেশ করিলেই সকল কার্য্য বিফল হয়। এই জন্য চেষ্টা করি, লোক যাহাতে অল্প থাকে। লোক বাড়ান ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ। "দেখ দেখ, পাঁচটী বিশ্বাসী বসিয়া আছে," এর মধ্যে এত লোক কিরূপে হইল? কি চমৎকার! পঞ্চাশ বৎসর এত অধিক লোক কিরূপে হইল, এত অধিক লোক ঈশ্বর করিলেন? অল্প লোকই স্তম্ভস্বরূপ হইয়া, মাথায় করিয়া ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিবে। দুর্জ্জয় দ্বাদশ ধরাতলে জয়ী হইল। এই জন্য যিনি আমাদের দেশ হইতে আসেন, তিনিই চান, অল্প লোক থাকে।

যখন দেখিলেন, অনেক লোক আসিতেছে, যেমন সঙ্গীতকার সা, ঋ, গা, মা করিয়া সুর চড়ান, তেমনই আচার্য্য উপরের দিকে সুর চড়াইতে থাকেন। অসংখ্য লোক এক শত লোক হইল। এখনও এত লোক? আসল পথে এত লোক? আরও শক্ত সাধন প্রবর্ত্তিত হইল। কেহ ইহাতে বিরক্ত হইল, কেহ নিন্দা করিয়া পলায়ন করিল। দুই শত লোক যখন পাঁচ জন হয়, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে। আচার্য্য বলেন, এত দিনে এত লোক হইল। পাঁচ শত সংখ্যাকে কাটিয়া কাটিয়া কপ্চাইয়া পরে ভিতরে পাঁচ জনের মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মসমাজের বল ঘনীভূত হইল। যে কার্য্যে ভাবনা অধিক, সে কার্য্যে এখানে ভাবনা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, এ গণিত শাস্ত্রে অনুমানের ব্যাপার; তা নয়।

একজনের জীবনে পঁচিশ বৎসর, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এ জীবনে যাহা কিছু জয়লাভ হইয়াছে, চিন্তা না করার দরুণ। টাকা জড় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যেখানে, সেখানে বিফল। যেখানে টাকা নাই, চিন্তা নাই, সেইখানেই জয় হইয়াছে। এ যদি চক্ষে দেখা সত্য হয়, তবে কেন না সকলে এ গণিতের প্রশংসা করিবে?

নিশ্চিত বলিতেছি, চিন্তা করিলে বিষয় রক্ষা হয় না, শরীর রক্ষা হয় না, ধর্ম্ম ত রক্ষা হয়ই না। বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্ব্বাণ লইয়া যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই জয়। যেখানে পর্ব্বত হাঁ করিয়া আছে, যেখানে দাঁড়াইলে পদস্খলন হয়, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন কর। লক্ষ টাকা পায়ের নীচে রাখিয়া তবে তুমি দয়াব্রত স্থাপন করিবে? না, না। দয়াব্রত স্থাপন কর, কাপড় ছিঁড়িয়া একটী সূতা হাতে করিয়া বল, আয় আয়, টাকা আয়। পরদিন সকালে সূর্য্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন, ঈশ্বর দিবেন। ঈশ্বরের ধন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ধন। সন্তান হইলে টাকার ভাবনা কি? নাটক করিতে হইবে, বিধবার চক্ষুর জল মোচন করিতে হইবে, দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে; ঘরে দেখিলাম, টাকা আছে, বুঝিলাম, দয়া-পথের কণ্টক। দুই পাঁচ দিন গেল, দেখিলাম, ঘরে একটীও পয়সা নাই; এখন ধর্ম্মের অভিনয় করিতে হইবে। প্রবর্ত্তক বলিলেন, ভবিষ্যতের বক্ষে টাকা আছে। পৃথিবীতে যখন টাকা আছে, সাহসে ভক্তেরা কাজ আরম্ভ করিলেন। যার দুই লক্ষ টাকা ছিল, সে দুই টাকা খরচ করিতে পারিল না। যার কিছু নাই,

সেই কাজ করে। কে না জানে, আমি ধনী? এক কোটী আমার হাতে, কেন না মনে করি? কেন না, জানি যে, একটীও টাকা আমার নাই। আমার কিছুই নাই; আমি কেবল ব্রহ্মধনে ধনী, ইহাতেই আমি সহস্র কাজ করিতে পারি।

যেখানে অন্যের গালে হাত, সেখানে আমার কোমরে হাত। অন্যে যেখানে সাহসী, আমি সেখানে যাইতে কুণ্ঠিত। অনেক টাকা যেখানে, দুইটা স্কুল হয়, চারিটা ব্রহ্মমন্দির হয়, অত টাকা যেখানে, ভাবি বিষ সেখানে। টাকা লইয়া লোকে মদে মত্ত হয়। সয়তানের ধন স্পর্শ করিয়া হরিসমাজ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইব না। যখন দেখি হরির টাকা, অমনই মাথায় ছোঁয়াই। হরির এক টাকা, লক্ষ টাকা। হরির টাকা না পাইলে সাহস হয় না। এ প্রণালী অবলম্বন করিতে যাঁহারা আদিষ্ট, তাঁহারা অবলম্বন করুন, এ প্রণালী অবলম্বনে দায়িত্ব আছে। ইহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। ঈশ্বরের ইসারা বুঝিয়া এ প্রণালীতে কাজ করিতে হয়। অনেকে না ভাবিয়া কাজ করিতে গিয়া, ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন। অনেকেই বলিলেন, "টাকার কি ভাবনা? মনে যদি করি, চিঠি লিখিয়া লক্ষ টাকা আনিতে পারি," এই বলিয়া সাহসে উড়িলেন; উড়িয়া পড়িলেন, ডুবিলেন। আমরা উড়িলাম, কিন্তু পড়িলাম না। পূর্ব্বে যত সাহস হইত, তদপেক্ষা অনেক সাহস বাড়িল।

যখন টাকা নাই, তখন প্রচারক-সংখ্যা যদি দশগুণ বৃদ্ধি হয়, প্রচারকদের মধ্যে আসিয়া যদি দুই শত লোক আশ্রয় লন, সকলকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব; কেন না টাকা নাই, জানি পয়সা কড়ির টানাটানি। এরূপ সময়ে দুই শত জন আসিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে

কুবেরের ধন আসিবে। একবার কাঁদিলেই হয়। এইরূপে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিয়া আসিতেছি। কখনও ক্ষতি নাই। খড়ো পোস্তায় দোকান, তৃণ দন্তে করিয়া ব্যবসায়; কিন্তু অভাব কখনও নাই। এক উপাসনা করিয়া, পাঁচটী তৃণ দন্তে লইয়া, যদি কেহ বলে, একটী বিদ্যালয় করিব, তাহাতে মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইবে; তাহার মুখ দেখিয়া বুঝি, হইবে। এক তৃণ দাঁতে করিয়া এ ব্যক্তি কত টাকাই আনিতে পারে। যার টাকা আছে, তাহার দ্বারা যাহা হয় না, যার টাকা নাই, তাহারই দ্বারা তাহা হয়। এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কে বুঝিবে? যাহা ভক্ত বুঝিতে পারে, বিদ্বান্ তাহা কিরূপে বুঝিবে?

না ভাবিয়া কার্য্য কর, ব্যবসায় কর, বাণিজ্য কর, সন্তানদের লেখা পড়া করাও, সকলই হইবে। সরস্বতী ও লক্ষ্মী, বিদ্যা ও ধন উভয়ই তোমার হইবে। তুমি ভাবিয়া কর, আমরা না ভাবিয়া করি। আমাদের নববিধানের লোক টাকা না লইয়া বহু কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারেন। "জয় নববিধান" বলিবই বলিব। তোমরা এক একটী পরিবার প্রতিপালন করিতে পার না, কিন্তু না ভাবিয়া বহু পরিবারের প্রতিপালন হয়। পঞ্চাশ জন কুমারীর বিবাহ দিতে হইবে, পীড়িতদিগের জন্য ঔষধ আনিতে হইবে, কিরূপে ইহা হইবে, কে চিকিৎসক ডাকিবে, ভাবিতে পারিবে না। ভাবিয়া কেহ কিছুই করিতে পারেন না। চিন্তায় মনুষ্য মগ্ন হইল, অথচ মেয়ের বিবাহ হয় না, ছেলের চাকরী হয় না, সন্তান না খাইয়া মরিল। পৃথিবীর পাণ্ডিত্যকে ধিক্। উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা করিতে না পারে, আমাদের

দেশের এক ভক্ত, ভক্তবৎসল আদেশ করিলে তাহা অনায়াসে করিতে পারে। আমি আরও দেখাব। আমার দলে যদি বিশ্বাসী লোক থাকে, তবে দেখাইবে যে, এ গণিত অভ্রান্ত। না ভাবিয়া, না ভীত হইয়া, যে আগুনের মুখে দাঁড়াইবে, তারই জয় হইবে। যার কিছু নাই, তারই জয়। অগ্নিমধ্যে দক্ষিণ হস্ত, প্রজ্বলিত হুতাশনে বাম হস্ত রাথ ; সাহসে পূর্ণ হও ; মুখে তৃণ করিয়া দণ্ডায়মান সাধক স্বর্গরাজ্যে বাস কর।

হে দয়াসিন্ধু, হে করুণাময় ! তোমার মতে চলিলে দেখান যায়, তুমি সত্য, তোমার অঙ্কশাস্ত্র সত্য। পৃথিবীর মানুষের বিদ্যা, বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। তোমার পথে গেলে যে সত্য শোনা যায়, আপাততঃ তাহা অসত্য বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু ঠাকুর, তা নয়, তা নয়। চলিতে চলিতে দেখি, কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! যে দেশে বড় বড় বীর আসিতে পারে না, সেই রাজ্যে আমরা আসিয়াছি। অর্দ্ধ পয়সায় আমরা যাহা করিয়াছি, লক্ষ টাকায় লোকে তাহা করিতে পারে না। আমরা উপাসনা খুব করি না, তাই আমাদের অভাব হয়। কৌপীনধারী যদি হই, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুষার ন্যায় যদি সর্ব্বত্যাগী হই, তবে দেখাইতে পারি, এক খণ্ড রুটীতে লক্ষ লোককে খাওয়ান যায়। প্রাণের সহিত ইহা বিশ্বাস করি। টাকার অভাবে সত্য স্থাপন হইবে না, এ আশঙ্কা কি আমাদের হয় ? আনন্দময়ী, সাহস দাও ; কেন সত্য স্থাপন হবে না ? এখনই তোমার দাসেরা দাঁড়াইবে। কি একটা ভারতবর্ষ ; পাঁচ ছয় জন লোক দাঁড়াইয়াছি ; ভারত জয় হবেই হবে। পাঁচ শত লোক দাঁড়াইলে বলিতাম, ঠাকুর ! এরূপ লোক কেন হইল ? ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাতে দ্বাদশ

লোক আছে। শিক্ষক উপদেষ্টা দশ বার জনের অধিক যে কখনও হয় নাই। তামাসা দেখিবার জন্য কি এই লোক? পুষ্টিসাধন কর, সমস্ত বল অল্প লোকের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া রাখ।" এখন ভয় করিব কেন? আর ত ভয়ের কারণ নাই। আমরা যে দেখিয়াছি, এইরূপ উপায়েই দিগ্বিজয়ী হইব। যত ভক্ত জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা উপাসনায় করিয়াছিলেন। প্রার্থনা উপাসনা করিয়াই তাঁহারা পারত্রিক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ধন যে অসার; আমরা তোমা ধন চাই; তোমার লোককে আমরা আদর করিতে চাই। সুবুদ্ধি দাও; তোমার যত লোক এই ধর্ম্মসমাজে আছেন, সকলকে সুবুদ্ধি দাও, ভাবনাশূন্য আকাশবিহারী পক্ষীর ন্যায় যেন তাঁহারা তোমার আদিষ্ট কাজ করিতে পারেন। কি ভয় লোকভয়ে? এইরূপে কাজ করিলে পৃথিবী ক্রয় হইবে। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্। পৃথিবীর রাজ্যবল, বাহুবল, ধনবলে ধিক্। ব্রহ্মবল যাহা পাইয়াছি, তাহাই দুর্জ্জয় বল। এই বলে বলী হইয়া বলিব, "জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়", অমনই আকাশ পাতাল কাঁপিবে। দুই পাঁচ জন লোক লইয়া পৃথিবী জয় হইবে। দয়াময়, পঁচিশ বৎসরের সখা! দয়া করিয়া যে সব সত্য বুঝাইলে, উপস্থিত বন্ধুদিগকে তৎসমুদয় বুঝাইয়া দাও। এই সত্য লইয়া যেন কেহ উপহাস না করেন। আমরা এই সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারাসক্তির হাত এড়াইব; তোমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিব। আমাদের মনে আর দ্বিধা নাই; আমাদের আর কি অভাব? তুমি যে আমাদের, আমরা যে তোমারই; তুমি যে আমাদের সর্ব্বস্ব ধন, তুমি সহায় হইলে, ধন সহায়, জগৎ সহায়। তুমি সহায় না হইলে কেহই সহায়

নয়। আমরা তোমাতে সকল পাইব, এই চাই। দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা পৃথিবীর কুটিল জটিল অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িয়া, তোমার নিকট প্রার্থনা করত, যেন মহৎ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, কৃপা করিয়া দুঃখী সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

একাদশ অধ্যায়।

জয়লাভ।

রবিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোলা হয়, তখনই এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ঋণ করিয়া কিছু ক্রয় করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিক্রয় হইবে না। যেরূপ সঙ্গতি ও সম্বল, তদনুসারে ক্রয় করা ও নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা, প্রথমাবধি নিয়ম ছিল। ইহা হইতে মন আর কখনও এদিক ওদিক নড়িল না। পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম না; যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না। যতটুকু অধিকার, তাহার অতিরিক্ত বিষয়ে হাত দিলাম না। যখন যতটুকু পাইয়াছি, যতটুকু প্রেমরস ঘটে ছিল, যতটুকু বিদ্যা ছিল, যেটুকু মানিতাম, সেইটুকুই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। এইরূপ অনেক বুঝিয়া বাণিজ্য চালাইতে হইয়াছিল; ক্রমেই কারবার বাড়িল; অনেকে কিনিতে আসিলেন। এইটুকু নিয়মের জন্যই কারবারের এত শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শাস্ত্রে লেখা আছে, কি অমুক বলিয়াছেন, এ বিবেচনা করিতাম না; জানিতাম, তাহা করিতে গেলেই গোলে পড়িব। পরের মুখে ঝাল খাইয়া শেষে বিপদে পড়িব, এ আশঙ্কা ছিল, এবং এখনও আছে। নিজে বুঝিব, পরে করিব, প্রথমাবধি এই প্রতিজ্ঞা ছিল। বৈরাগ্যই হউক, আর যোগই হউক, পরের কথায় লইব না। ভিতরে কি আছে, শেষে কি হইবে। অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া

উচিত নয়। চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, দেখিব, পরিষ্কার করিয়া বুঝিব। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? মা বাড়ীতে আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি; গুরু ঘরে আছেন, অর্থ তাঁর কাছে বুঝাইয়া লই; বন্ধু দক্ষিণ হস্তের কাছে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই বলি, "হরি, আমাকে সাহায্য কর।"

ঘরে টাকা সঞ্চিত, তাই খরচ করি। অধিক খরচের আবশ্যক হইলে ভগবান্ দিবেন। ধনী মহাজন পরে যদি হই, বৃদ্ধি করিব, এই বলিয়া চলিলাম। বাজারে খুব ভাল করিয়া ব্যবসায় চালাইলাম, ধার হইল না। অল্প টাকার অল্প ব্যবসায়কে ভগবান্ প্রচুর ধন সম্পত্তির কারণ করিলেন। যাঁহারা কিনিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে ধারে দিতাম না; ঈশ্বরের সঙ্গে যে কারবার করিয়াছি, তাহাও নগদে। নগদ পাইবার আশা। নগদ না পাইলে বিক্রয় করিব না, এ নিয়ম ঈশ্বরদত্ত। লোভপ্রযুক্ত সন্দেহ, অবিশ্বাসের জন্য এ বিধি লই নাই। জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন, তিনি নগদ দেন, ধারে দেন না। নগদ বহুমূল্য ঐশ্বর্য্য তিনি অর্পণ করেন। এই জন্য বিশ্বাস হইল, যাহা কিছু প্রয়োজন, যতদূর মনুষ্যের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব। সাধন করিলাম; ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ধন আশা না করাতে লাভ হইল। রাত্রি কাটাইলাম; পরদিন প্রাতে অভিলষিত ধন পাইলাম। পরে পাব, মনে করিলে হইবে না। সেই জন্য প্রণাম করিয়া বলিলাম, প্রভু হে, বলিয়াছিলে নগদ দিবে, দাও; বিলম্ব করিব, কিন্তু তোমার নিকট হইতে লইয়া যাইব।

ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, আপনার সম্বন্ধে, পৃথিবীর সম্বন্ধে, দেশের

সম্বন্ধে, মানবমণ্ডলীর সম্বন্ধে যাহা যাহা চাহিয়াছি, সকলই পাইয়াছি। পাইতে বিলম্ব হয়, পাওয়া হয় না, হওয়া অসম্ভব, এ সকল কথা শুনিয়াছি। পরলোকে ফললাভ হইবে, কীর্ত্তি স্থাপন হইবে, এখানে কেবল শস্য-বপন; অপরাপর শাস্ত্র পড়িয়া দেখিলাম, এরূপ বিশ্বাসের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাহা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে কত লোকের শরীর অবসন্ন হইল, দিন যামিনী কাটিয়া গেল, আমাদের সামান্য বলে, সামান্য চেষ্টায় তাহা লাভ হইল। অনেক ধর্ম্মসংস্কারক মহামতি পণ্ডিত সত্য বিস্তার করিতে কষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক পরিশ্রমের পর ভবের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হইয়া, পরলোকে গেলেন। বীজ বপন করিবার সহস্র বৎসরের পর আমরা ফল সম্ভোগ করিতেছি। এ সময় অনুকূল হইল; প্রবল প্রেম প্রবলতর হইয়া অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এখন দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে পাঁচ শত বৎসরের ফল হয়; এক দিনের কাজ এক ঘণ্টায় হয়। যে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে অনেক বৎসর লাগে, ফল প্রস্তুত হওয়া অনেক সময়-সাপেক্ষ, এখন তাহা অল্পেই হয়। ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল; দুই বৎসর যাইতে না যাইতে দেখি, প্রচুর ফল; লোকে লোকারণ্য। দুর্ব্বহ ভার লইবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিতেছে।

কি ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পরে! এ ব্যাপার ত কেহই জানিত না। কল্পনাতেও কেহ ধারণ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে কি বিবাদ ছিল; অধর্ম্মের প্রতি লোকের কি আসক্তি ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল; ভক্তি প্রেমের কি অভাব ছিল; দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে উৎসাহের কিরূপ

অভাবই ছিল। দশ কুড়ি বৎসরের অপ্রতিহত যত্নের পর সত্য বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইল। অনেক কীর্ত্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল। এমন বৎসর যায় নাই, যে সময় উন্নতি হয় নাই। এমন মাস কই, এমন সপ্তাহ কই, যে সময়ে ঈশ্বর নিদ্রিত ছিলেন, লোকে স্বর্গের কথা শুনিতে পায় নাই। সিংহ বাড়িল; বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ কাঁপিতেছে, টল্‌মল্‌ করিতেছে। নববিধান সম্বন্ধে কি কার্য্য হইয়াছে, যাহা পূর্ণ হয় নাই? এমন কি কার্য্য, যার ফল না ফলিয়াছে? বড় বড় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; ছোট ছোট কর্ম্ম, যাহা ভক্ত হরিনাম করিয়া আরম্ভ করিলেন, তৎসমুদয়ও সফল হইল। এখন সত্য সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া, সত্য অগ্নির মধ্যে হাত রাখিয়া বলা যায়, যাহা পাইবার পাইয়াছি, যাহা দেখিবার দেখিয়াছি।

আনন্দবাজারে যাঁহারা দোকান খুলিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রচুর লাভ হইয়াছে। যত কারবার করিলাম, কেবল লাভই হইল, ক্ষতি হইল না। আর কিছুতেই ভীত হই না, কিছুতেই ব্যথিত হই না। যে হিসাবের কাগজ খুলি, দেখি, পাঁচ টাকায় আরম্ভ, পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ। খড়ো পোস্তায় যে দোকান করিয়াছিল, তার টাকার সংখ্যা নাই। জন্মের পর যার জন্য ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে 'জয়লাভ' লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার জয়লাভ কে খণ্ডন করিতে পারে? ঈশ্বর বলিয়াছেন, "এরা জয়ী হইবে; ধূলিমুষ্টি ধরিবে, স্বর্ণমুষ্টি হইবে। হরিনাম করিয়া যা করিবে, তাহাতেই পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।" স্বার্থপর হইয়া কাজ করি নাই, দুই টাকার লোভে উপার্জ্জন করিতে আসি নাই, দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিলাম। হরি সকাল

বেলাই বলিলেন, 'বর লও।' ভক্ত কি বর চাহিলেন? এই বর চাহিলেন, যেন জয়ী হই। তখন নিজ হস্তে হরি লিখিয়া দিলেন, 'ভক্তের জয়, নিঃসংশয়'। এখন দেখিতেছি, ভক্তির সহিত যা করা যায়, তারই জয় হয়।

এ সময় আশ্চর্য্য প্রমাণস্থল এত হইতেছে যে, আর গণনা করিতে পারি না। বল শত্রুগণ, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে, নববিধান সম্বন্ধে, কোন্ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা পূর্ণ ও সফল হয় নাই? দেশে হরিনামের রোল উঠিল। কি হইল দেখ! যে দেশে মদ্যপান প্রবল হইতেছিল, গৌরাঙ্গের মধুমাখা হরিনামে সেই দেশ উন্মত্ত হইল। কে জানিত, দেশের লোকে ইংরাজী শিখিয়া, মৃদঙ্গ বাজাইয়া, ছোট লোকের মত কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবে? অবিশ্বাস, নাস্তিকতা আসিতেছিল, বন্যার মত অবিশ্বাসের ভাব প্রবল হইতেছিল, বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিত নয়নে, কে জানিত এমন সময়ে, 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি', 'সর্ব্বেশ্বর মহেশ্বর হৃদয়েশ্বরকে এই ধরেছি' বলিবে? এ ব্যাপার এখন চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। এখন শাক্ত বৈষ্ণবে মিল হইয়াছে। কালী কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসিলেন। কালীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে কালী দেখিতেছেন ভক্ত। শক্তিকে ভক্তি, ভক্তিকে শক্তির ভাবে পূজা হইতেছে। বঙ্গদেশে শাক্তভক্ত, ভক্তশাক্ত এক হইতেছে। শাক্তের মন্দির ও ভক্তের মন্দির দুই একত্রে মিলিয়া এবার এক সোণার মন্দির হইবে।

যে ভক্তি ছিল মার প্রতি, হরিকে সে ভক্তি দেওয়া হইল; হরিভক্তেরা হরিকে যে ভক্তি অর্পণ করিতেন, মাকে সেই ভক্তি

দিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে নববিধানে দুই এক হইল। পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম সফল হইতেছে। দেশে জাতিভেদ প্রভৃতি কত কুসংস্কারের প্রভাব ছিল। এই মন সে জন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছে। কোথায় গৌরাঙ্গ? কোথায় শ্রীচৈতন্যের জাতিনির্ব্বিশেষে প্রেম? এই বলিয়া প্রাণ কত কাঁদিয়াছে। এক এক ফোঁটা জল পড়িল, আর লক্ষ লক্ষ বিঘায় ফসল হইল। নিজগুণে এত হইল না; সকলই হইল হরিপদ ধরাতে। ধূলি যদি এক মুষ্টি ধরা যায়, আবার বলিতেছি, স্বর্ণমুষ্টি হয়। হরিনাম বিদ্বান্ সভ্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বঙ্গদেশে নবাদের মধ্যে মুনি ঋষিগণ আসিতেছেন। আমরা কত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; সেই প্রার্থনার জন্য, ভিক্ষার জন্য, হরি এই সব করিয়া দিতেছেন। এই জন্যই বলিতেছি, আমাদের নগদ নগদ লাভ হইতেছে। দেশের কোন একটা সেবা করিতে হইবে। দশ সহস্র লোকের আসাতে পাছে তাহা বিফল হয়, অমনই দেখি, ভক্তদল অন্ন হইয়া পুষ্ট হইতেছেন। সকল দিকেই কেবল মঙ্গল দেখিতেছি।

হরিনাম কি প্রবলই হইয়াছে! পঁচিশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। এখন যদি শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্বলিত হয়, বিপদ আসিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি ভয় নাই। কেন না, জয়ী হইবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি; কোন যুদ্ধে হারি নাই। যত মহারণে প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলাম, সর্ব্বত্রই জয় হইল। হরি হস্ত দ্বারা আমাদের স্পর্শ করিলেন, আমরা দুর্জ্জয় হইলাম! তাঁহার প্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিয়াছি। চারিদিকে আমাদিগের এক

শত দুই শত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন হইল। হরি বলেন, কি পরিশ্রম করিয়াছিস্? এক গুণ শ্রমের দশগুণ ফল দিয়াছি। এরূপ না হইলে কি চলে? হাতে হাতে লাভ। আমরা যে রোজ খাটিয়া খাই। নতুবা যে প্রাণপতির কথা ভাল লাগে না। রোজ না পাইলে আমরা থাকিতে পারিব না জানিয়াই, হরি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন একগুণ শ্রমের দশগুণ ফল পাইলাম; মনে হইতেছে, বার্দ্ধক্যের ভিতরে আবার বালক হই। আবার মহা পরিশ্রম করিয়া বঙ্গদেশকে কাঁপাই। কোটী বালক আসিয়া যেন দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। যৌবনকাল ফিরিয়া আসিয়া চক্ষুকে অগ্নিময় উৎসাহে জ্বলন্ত অগ্নিসম করিতেছে। ঈশ্বরের কার্য্যে কি জীবন দিব না?

অনেক ব্যথিত হইলাম, উৎপীড়িত হইলাম, অনেকের নিকট পদদলিত হইলাম; তথাপি আমি মনে করি, আমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই। হরি ধন্য, হরি ধন্য, হরি ধন্য! আমার কেবলই লাভ হইতেছে। আমি যে কার্য্য করিয়াছি, সেই কার্য্যই সহস্র সহস্র লোককে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ঘরে লুকাইয়া থাকিলেও দেখিব, দশ সহস্র লোক 'হরি হরি' বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'হরি হে! এ জন্য কি আমি কাঁদি নাই?' অমনই হরি কলিকাতায় বৃন্দাবন দেখাইলেন; সেই যমুনা, সেই প্রেমের ব্যাপার দেখাইলেন। টাকা সম্পদ পাই নাই বলিয়া কি আমার দুঃখ হইতেছে? তালুক মুলুক না পাওয়াতে কি ক্ষোভ আছে? আমি যে হরদাস; প্রভুর যাহা, দাসেরও যে তাহা। ব্রহ্মাণ্ড যে আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি, কখনও হারিবার জন্য?

রসনায় যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে এ রসনা কখনও হারিবে না। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, যদিও ধন নাই, মান নাই, অধিক সাধন ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার দলের উপর আছে। এই যে দেখিতেছি, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের দলে আসিয়া নাচিতেছেন। সমস্তই চক্ষে দেখিয়াছি; অবিশ্বাস করি কিরূপে? এ ভক্ত হারিল না, কিছুতেই হারিল না; কেবলই জয়লাভ করিল; আর কি সংবাদ চাও? জয়ী হইয়া হরিনামের নিশান পথে পথে উড়াইয়াছি। অহঙ্কারে স্ফীত হই নাই। হরিনামের জোরে তোমার আমার মত লোক সব করিতে পারে। হরিনামের জোরে আমরা পৃথিবীটাকে শরার মত বোধ করিয়া ছুড়িয়া বৈকুণ্ঠে ফেলিব।

আমরা নরাধম বলিয়াই এখনও এত দুর্দ্দশা রহিয়াছে; কিন্তু দুর্দ্দশার মধ্যেও দেখিলাম, জঘন্য অসার জিনিস হাতে করিয়া হরি বলিবা মাত্র স্বর্ণ হইল। মাঠের মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টানে হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে। যুবক বৃদ্ধে মিলিয়া প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছে। সহস্র উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। বঙ্গবাসী! শীঘ্র চলিয়া আইস। সুবাতাস বহিতেছে, চলে এস। ভক্তিঘাটে এস; পাল তোল, নৌকা ছাড়। একজন পাপিষ্ঠের জীবন যদি এত কীর্ত্তি স্থাপন করে, তোমরা সমগ্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিমা কত বিস্তার করিতে পার; দেশে কত কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পার। এক পাপী এত দেখালে; তোমরা সহস্র সাধু আরও অনেক দেখাও। দেশকে এখানে রাখা হইবে না। কল্যাণের রথ, পুণ্যের

রথ আসিয়াছে; নর নারীকে সংবাদ দাও। কার সাধ্য, আমাদের মস্তককে খণ্ড খণ্ড করে? কার সাধ্য, এই সকল অমরাত্মার উপর হস্তক্ষেপ করে? দুর্জ্জয় হইয়া, এই বঙ্গদেশকে লইয়া স্বর্গে ফেলিয়া দাও।

হে দীনশরণ, হে ভারতের পরিত্রাণকর্ত্তা! আমরা কি সুখই পাইলাম। লোকে বলে, সংসার বিঘ্নময়; যদি বীজ বপন করি, বৃষ্টি হয় না; রৌদ্রে শুষ্ক হয়। দুঃখের কথা আমরা অনেক শুনিলাম। অষ্ট প্রহর যাঁহারা তোমার প্রসঙ্গে থাকেন, তাঁহারাও ভয়ের কথা অনেক শুনাইলেন। কিন্তু আমরা তোমার প্রসাদে কথনও ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাহারও নিকট হার মানিব, এ কথা মনে করিলাম না। হরিনামের বল যখন আছে, তখন লড়াই করিলাম; প্রাণ থাকে আর যায়। অভেদ্য সাজ পরিয়া যে শয়তানের সহিত যুদ্ধ করে, তার কি মরণ আছে? তাই যদি হইবে, তা হলে ধ্রুবকে যে ব্যাঘ্রে বিনাশ করিত। এমন যে কথনও হয় নাই, এমন যে হইতে পারে না। তাই বিপদকালে 'হরি হরি' বলিয়া কত ডাকিয়াছি। দেখ, মা, দেখ, আজ জয়ী হইয়া আমি কত রাজ্যের রাজা হইয়াছি। দেখ, মা, দেখ, অস্পৃশ্য বলিয়া যাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করিতেন, তাঁরা আজ অতিথি হইয়া আসিয়াছেন। মা, দেখ, যাঁহারা কলসী ভাঙ্গা মারিতেন, কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি করিতেন, তাঁহারা আজ কাছে আসিয়া বলিতেছেন, "কই, তোমাদের মা কই? আমরা তাঁহাকে পূজা করিব। আমরা নববিধানের বিপক্ষতা করিয়াছি; আমরা ঈশ্বর-সন্তানদের রক্ত দেখিয়াছি; এবার তোমাদের মাকে মা'নব।" মা! আমাদের আর কিছু দাও না দাও, জয় দিয়াছ। জয় নিশান;

উড়িল; জয়বৃষ্টি হইল; এজন্য আমরা তোমায় ধন্যবাদ করি। দুঃখী দুঃখিনীদিগকে এত সুখ দিলে? ধারে ধর্ম্ম করিতে হইল না। নির্জ্জন কাননে অনিশ্চিত জয় লক্ষ্য করিয়া কাল কাটাইতে হইল না। কত লোকে জয়ের জন্য অনিশ্চয়ের পথে প্রতীক্ষা করিতেছে; বড় আহ্লাদ আমাদের যে, আমাদিগকে সে পথে যাইতে হয় নাই। আমরা পৃথিবীতেই বৈকুণ্ঠ দেখিলাম। সম্মুখে বাহিরে বৈকুণ্ঠধাম। বঙ্গদেশ টলমল্ করিতেছে। ছিল না হরিনামের প্রভাব, মৃদঙ্গ সহকারে হরিনাম হইল। যুবক বৃদ্ধ এখন সংগ্রাম করিতেছে, কে কত নাচিতে পারে, এই বলিয়া। কার হরিভক্তি অধিক, এই বলিয়া বঙ্গদেশের লোকে কোলাহল করিতেছে। হরি, কি দেখিয়াছিলাম, আর কি দেখিতেছি! আমরা তোমাকে পূজা করিয়া অনেক লাভ করিলাম। এ ধনের গুণ এক মুখে বর্ণন হয় না। বৈকুণ্ঠে কি পাব, সে পরের কথা; আজ যা পাইয়াছি, তাহাতেই বড় আনন্দ। হরিপাদপদ্ম হাতে পাইয়াছি। এদেশে এত সংশোধন হইতেছে। এত লোক আমাদের দিকে আসিতেছেন। কত যে উন্নতি হইতেছে, কত দলাদলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, কালভেদ বিনষ্ট হইতেছে, কে বলিতে পারে? হরি, বিশ্বাসের আলোক সঞ্চার কর, লোহার ভারত সোণার ভারত হইবে; কলিযুগের ভারত সত্যযুগের ভারত হইবে। পুণ্যচন্দ্রের আলোক ভারতে পড়িয়াছে; আহা! দুঃখিনী ভারতমাতার এত হইল! মাতৃভূমি ধন্য হইল। কৃপাসিন্ধু, এই আশীর্ব্বাদ কর, হারিব না মনে করিয়া প্রাণপণে যত্নের সহিত যেন তোমার নববিধান সর্ব্বত্র প্রচার করি। মা দয়াময়ি, কৃপা করিয়া তোমার সন্তানদিগকে আজ আশীর্ব্বাদ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিয়োগ ও সংযোগ।

রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ১৫ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

মন পূর্ণ বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে, আবার খণ্ড খণ্ডকে একত্র করিয়া এই মনই সংযোগ করে। আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধেও বিয়োগ ও সংযোগ সর্ব্বদা চলিতেছে। যেমন জড়জগতের বস্তু সকল বিযুক্ত হইয়া পরমাণুতে পরিণত হয় ও পরমাণু সকলের সংযোগে বস্তুসমূহ গঠিত হয়, মন তেমনই ধর্ম্মরাজ্যে বসিয়া সর্ব্বদা বিয়োগ ও সংযোগ-ক্রিয়া সমাধা করিতেছে। কাহারও মনে এই বিয়োগ-ভাব প্রবল; কাহারও মনে আবার সংযোগ-স্পৃহা বলবতী। কেহ কেবল একটী বস্তুকে চিন্তা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছে; একটী ভাবকে খণ্ড খণ্ড ভাবিয়া অধ্যয়ন করিতেছে; এক বস্তুর গুণগুলি এক এক করিয়া ভাবিতেছে। কোন কোন লোক আবার বিয়োগের দিকে যাইতে চায় না; অখণ্ড বস্তু দেখিতে চায়। কত আর এক এক করিয়া গুণ ভাবিব, কত আর পূর্ণ বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া করিয়া অবলোকন করিব, এ চিন্তা কাহারও কাহারও মনে প্রবল দেখা যায়। আমার স্বভাবের মধ্যে দুয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। এক সময়ে দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইল, এরূপ বলা যায় না।

সাধারণ মানবমণ্ডলীর ন্যায় আমিও প্রথমে আংশিক দর্শনের পক্ষপাতী ছিলাম। প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল। একটী একটী করিয়া বুঝিব, এই ইচ্ছাই বলবতী ছিল।

কিসে পাপ যায়, প্রথমে এই একই চেষ্টা ছিল ; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হয়, এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেবা করিয়া সার্থকজন্মা হইব, কয়েক মাস ধরিয়া এই একটী ভাবই মনের স্থায়ী ভাব হইল। কিসে স্বার্থপরতা যায়, দয়ায় ডুবিয়া থাকিতে পারি, কথনও এই চিন্তা প্রবলা হইত। কথনও বিদ্যার প্রতি অনুরাগ হইত, কথনও বা বিরক্ত হইতাম। কথনও গ্রন্থ না হইলে তৃপ্তিবোধ হইত না, কথনও গ্রন্থ ভাল লাগিত না। দুই ভাবই মনে ছিল ; কিন্তু একটী একটী করিয়া সাধন করিয়াছিলাম। কথনও বৈরাগ্য, কথনও পুণ্য, কথনও প্রেম, এক একটী করিয়া সাধন করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইল। বাহিরে ন্যায়ের ভাব দেখিলাম, অন্তরে অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা অত্যন্ত শক্তি ও পরাক্রমের সহিত আবির্ভূত হইল। অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্ত্তে দয়ার ভাব ও অনুতাপের পরিবর্ত্তে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইল।

যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না ; যখন যেটী প্রয়োজন, তখন সেইটী ধরিবার জন্যই চেষ্টা ছিল। বিয়োগ-স্পৃহাতেই দিন যাইতে লাগিল ; আবশ্যক যেটুকু, সেইটুকু ধরিবারই ইচ্ছা হইত। অখণ্ডে অনুরাগ হইত না ; অখণ্ড ধরিতে পারিব না, অখণ্ড ধরিবার প্রয়োজন নাই, এই চিন্তাই মনে হইত। সম্মুখে ঔষধালয় দেখিলাম, সমগ্র শোভার দিকে দৃষ্টি নাই। রোগীর যে ঔষধ প্রয়োজন, তাহার জন্যই হস্ত প্রসারিত হইবে। নববিধানের ভাব তখনও আসে নাই ; সৌন্দর্য্যবোধ জন্মে নাই। রোগ প্রতিকার করিয়া পরে দেখিব, পক্ষপাতী হইলাম কি না, এই ইচ্ছাই গূঢ় ভাবে ছিল। ভয়ানক

রোগ, ভয়ানক অভাব; সুতরাং বিয়োগ-স্পৃহা প্রাবল্য সহকারে হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। যখন এক একটী অভাব মোচন হইতে লাগিল, তখন দেখি, প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশল। যদিও প্রকৃতির ক্রিয়া গদ্যে লেখা হইতেছিল, পরে দেখি, তাহার মধ্যে পদ্যও অনেক। দেখিলাম, প্রকৃতির কৌশল একটীর পর একটী আনিয়া নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সকলগুলির সংযোগ করিতেছে। জবা ফুলের যখন প্রয়োজন হইল ভক্তির সহিত লইলাম; তুলসীর যখন আবশ্যক হইল, তুলসী লইলাম ভক্তির সহিত। পরে দেখি, কে সমস্ত সংযোগ করিয়া পুষ্পমালা রচনা করিতেছেন। প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব; পরে দেখি, প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।

কে জানিত, ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর না করিলে আমার চলিতেছে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিয়া হৃদয়ে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত, তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন? ভিতরে ভিতরে কেহ যে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের গতি ও অন্তরের রুচি অনুসারে যখন যাহা প্রয়োজন বোধ হইত, তাহাই খণ্ড খণ্ড ভাবে ধরিতাম। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে বিয়োগ সংযোগের সামঞ্জস্য হইবার মূল ছিল। কোন ভাবে মন অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না, অদ্যাবধি দেখিতেছি, এই ভাবই প্রবল। অধিক কাল কোন একটী গুণের মধ্যে যে বদ্ধ থাকিব, তাহা থাকিতে পারি নাই। ন্যায় চিন্তা করিলাম পাপের

জন্য; কিছুদিন পরে বলিলাম, এরূপে থাকিলে আংশিক সাধন হইবে। অমনই প্রেমের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। খুব প্রেম ভাবিলাম, দিন রাত্রি সহাস্য ভাব ধরিয়া রহিলাম। আবার মন বলিল, অত দৌড় ভাল নয়; এবার বিপরীত দিকে অনেক দূর গতি হইয়াছে। আবার ন্যায়ের দিকে গেলাম। যেই দেখিলাম, সেই নৌকা এক দিকের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার টানিলাম। এইরূপে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিতেছি।

অনেক পড়া শুনা করিলাম, দেখিলাম, মন বুদ্ধির হাতে পড়িয়া মারা যায়; অমনই বালকভাব কিসে হয়, সারল্য কিসে হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এক দিকে বিপদ দেখিলেই অপর দিকে দৌড়াই। ক্রমাগত কেবল সামঞ্জস্যের চেষ্টাই হইতেছে। আমার সম্বন্ধে যেমন, অপরের সম্বন্ধেও তেমনই। যখন দেখি, ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে পরিশ্রম ও কর্ম্ম প্রবল হইতেছে, তখন মনে হয়, এ সব ফিরাইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে লওয়া উচিত। চারি সপ্তাহ মধ্যে দেখি, কর্ম্মশীল ধ্যানশীল হইয়াছেন। কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধ্যানের গভীর আনন্দ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। আবার যখন দেখি, ধ্যান করিতে গিয়া কেহ আর পরসেবা করে না, অমনই বিবেককে ডাকিয়া আনিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্থাপন করি। আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই, কেবল এক খণ্ড হইতে বিপরীত খণ্ডে যাই। এইরূপে দিন গেল বটে, কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকেই যাইতেছি। আংশিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে। এখন আর আংশিক উন্নতি সাধন করিতে পারি না।

স্বদেশে, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না। ঈশ্বরের পূর্ণ গুণ; ষোল আনা তাঁর দয়া। আমার সেরূপ নাই। তাঁহাই যেমন বৈরাগ্য, তেমনই আনন্দ। আমার বৈরাগ্য হইলে আনন্দ কমে, আনন্দে মাতিলে বৈরাগ্য কমে। আমি হয় ত ব্রহ্মকে জলে তত দেখিতে পাই না, যেমন দেখিতে পাই স্থলে। আমি এক খণ্ডে ঈশ্বর দেখি, অপর খণ্ডে দেখিতে পাই না। পুণ্যাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই, পাপীর মধ্যে দেখিতে পাই না। পাপী যে, সেও ঈশ্বরসন্তান, পুণ্যবান্‌ও ঈশ্বরসন্তান। পাপীর মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আমি ঈশার ঈশ্বরকে দেখিব, বুদ্ধের ঈশ্বরকে দেখিলাম না? তুমি বুদ্ধি করিয়া একজনকে রাখিয়া, একজনকে ঘর হইতে তাড়াইবে? তুমি মনে কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম হৃদয়কে আনন্দিত করিবে, ঈশার বিবেক তোমাকে সুখী করিতে পারিবে না? তুমি বুঝি, হৃদয়ে গুপ্ত পাপ গোপন কর? তাই বুঝি, ঈশাকে তাড়াইবে? কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ করিতেছ, পাপ দেখিতে চাও না? আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম সুখ চাও, তাই বুঝি, তোমার এ প্রকার ভাব? অংশে আর মন তৃপ্ত হয় না।

একজনকে ভালবাসিয়া আর একজনকে কম ভালবাসিলে, মনে হয়, উনি কি মনে করিবেন? বুদ্ধকে অনাদর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ে বসাইলাম, বুদ্ধ কত কি মনে করিতেছেন? গৌরাঙ্গকে আদর করিয়া, ঈশাকে দূর করিয়া দিলাম? আমি

বাঙ্গালী হিন্দু, তাই বুঝি, গৌরাঙ্গকে ভালবাসি! ঈশা পরদেশী, তাই বুঝি, ঈশাকে ভালবাসি না? প্রাচীন ঋষিরা ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসিতেন, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, পাছে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়, তৎক্ষণাৎ গেলাম ঋষিদিগের বাটীতে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম লইলাম, গৈরিক বস্ত্র পরিলাম। ঋষিগণ, আশ্রমবাসিগণ, সভ্যতার খাতিরে সম্ভ্রম রাখিতে পারি না। এস, উনবিংশ শতাব্দীতে তোমাদের ভালবাসিব; এস, তোমাদের আদর করি। এই বলিয়া ঋষিদের আদর সম্মান করিলাম। যখন এক সাধু লই, তখনই আর এক সাধু কাছে আসেন। ভগবান্ হৃদয়ের নারদকে শিখাইয়াছেন, যখন একজনকে নিমন্ত্রণ করি, এক সত্যকে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সাধুকে, সত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটী লইব মনে করি, নারদ তাহা করিতে দেন না। একটীকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়। ঈশা মুসা যেন পরস্পর হাতে হাতে বাঁধিয়াছেন।

এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম, নব ব্রাহ্মধর্ম্মকে। অন্যে আংশিক ভাব রাখিতে পারেন, নববিধানে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার জীবনে যখন দেখিয়াছি, এক একটী লইলে অপরাধ থাকে, তখন এই নূতন নামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক। বয়স বাড়িল, পূর্ব্বকার উপার্জ্জিত আংশিক ভাব এখন তোড়ার মত করিয়া বাঁধিলাম। ফুলের তোড়ার মত সাধুরা মিলিত হইয়াছেন। সত্যের তোড়া বাঁধা হইয়াছে। কোন দিন ঋষি আসিলেন, কোন দিন পঞ্জাবের নানক আসিলেন, কোন দিন অযোধ্যার কবির আসিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিতে লাগিলেন, ঈশা গৌরাঙ্গ

সকলেই আসিলেন। ভিতরে যিনি কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, সকলেই বস। কখন অনুতাপ, কখন সদনুষ্ঠান, কখন বৈরাগ্য, কখন আনন্দ, কখন বৃদ্ধভাব, কখন বাল্যভাব, কখনও বা যুবার উৎসাহ, এক এক করিয়া সমস্তই আসিতে লাগিল। যিনি জীবনের মূলে ছিলেন, তিনি সকল রত্ন পাইয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইয়া দিলেন। কখনও ইহলোকের সৌন্দর্য্য, কখনও পরলোকের সৌন্দর্য্য উপস্থিত হইল। ইহলোক পরলোক এক হইল। বাড়ীতে বসিয়া স্বর্গসুখ লাভ করা হইল।

দুই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল, একটীর পর আর একটী আসিয়া এখানে সমুদয়ের মিল হইয়াছে। সমুদয় যন্ত্র মিলিয়া এক যন্ত্র হইল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া এক সুমিষ্ট স্বর উৎপন্ন হইল। এখন পূর্ণতা চাই। পূর্ণতার দিকেই এখন যাইতেছি। ক্রমাগত চলিতেছি। ভ্রাতা বন্ধু যাঁহারা দৌড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন। এই সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি কখনই দাঁড়াইল না, ক্রমাগত চলিতেছে। পথিক নাম দিয়া ভগবান্ আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; পান্থশালা পাইব না, বলিয়া দিয়াছিলেন; তাই ক্রমাগত চলিতেছি। বর্ষায় দৌড়িয়াছি, শীতে দৌড়িয়াছি, ঋতুর বাধা মানি নাই। বাল্যকালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও দৌড়িতে হইবে। নববিধানের পূর্ণতা হইবেই হইবে। এই পথিকের সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রস্তুত হউন। এখনও ঢের অভাব আছে। ভাই বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না; আর নববিধানের বক্ষ বিদারণ করিও না।

হে দীনবন্ধু, হে পূর্ণব্রহ্ম! যেমন আমরা অংশ অংশ করিয়া ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম, সমস্ত পৃথিবী সেইরূপ দোষ চিরকালই করিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব সাধন করিলেন, তাই এত বিরোধ। আমরা যখন হিন্দুসমাজে ছিলাম, যখন অবিশ্বাসের মধ্যে ছিলাম, তখন আমরাও কেবল আংশিক সাধন করিতাম। এখন বুঝিয়াছি, এক একটী করিয়া সকল লইয়া পূর্ণ হইতে হইবে। যতদিন হইতে নববিধান মনের মধ্যে এসেছে, ততদিন হইতে কেবল মনে হয়, হায়! ঈশাকে লইলাম, প্রাণের বন্ধু গৌরাঙ্গকে তাড়াইয়া দিলাম? ভক্তি বুঝি কাঁদিতেছেন, ন্যায়ের পক্ষপাতী হইতে গিয়া বুঝি ভক্তিকে মারিয়াছি? একটী ভাইকে হৃদয়ের রাজা করিয়া আর একটি ভাইকে মেরেছি? এক ভগ্নীকে স্বর্ণালঙ্কার দিয়া আর একজনকে বলেছি, দূর হয়ে যা? এখন আর তাহা পারি না। সকলকে অনাদর করিয়া ঈশাকে যদি আদর করি, বাড়ী গিয়া দেখি, দুঃখ হয়; দেখি, ঈশাও বড় দুঃখিত হয়েছেন। তাঁকে এমন আদর করিয়াছি যে, তাঁর অন্যান্য ভাইগুলিকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছি? পূর্ণব্রহ্ম, তোমার রাজ্যে উদার প্রেম। তোমার সন্তানেরা চান, তাঁরা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া থাকেন। তোমার ন্যায়ের সঙ্গে তোমার প্রেম নৃত্য করে। তোমার যত গুণ মিলিয়া এক গুণ হয়। সমস্ত রং মিশিয়া যায়। আমি দেখিলাম, সাত রং মিশিয়া এক রং হইল। দেখিলাম, নববিধানের কি আশ্চর্য্য শোভা! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি পূর্ণব্রহ্মরূপ দেখি, ব্রহ্মের পূর্ণ পরিবার দেখি, পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখি। তাহা হইলেই সকল খেদ মিটিয়া যায়। চারিদিকের লোকের ব্যবহার দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। কেহ

কেবল পাপ করে; কেহ কেবল সুখ সুখ করিয়া বেড়ায়। কেহ ঈশাকে লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকেন, কেহ গৌরাঙ্গকে লইয়া উন্মত্ত হন। কেহ কর্ম্মশীল হইয়া আর সব পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বিবেক লইয়া আর সব লইলেন না। আর গুণের খণ্ড দেখা যায় না। দেখিতে গেলেই যেন এবার অখণ্ড দেখা যায়, এমনই কর। অখণ্ড ভাব দেখিয়াই যেন সকলের ভক্তিভাব, পুণ্যভাব উথলিয়া উঠে। সমুদয় সাধুমণ্ডলী দেখিয়া যেন প্রাণ মন আনন্দিত করি। একটী দুইটী তিনটী দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না। নববিধান দিয়াছ, এখন ইচ্ছা করি, অমনই পূর্ণ হই; যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পূর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে চাই না; আর অংশ লইতে চাই না। ব্রহ্মের সন্তান হইয়া খণ্ড খণ্ড লইব? পূর্ণব্রহ্ম, এস; এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি, তবে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপুণ্য, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণশক্তি লইয়া এস। গরিবকে আর কষ্ট দিও না। দুই হাত প্রসারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণভাবে হৃদয়ে এস। যে অংশ চায়, সে অংশ পায়; যে পূর্ণতা চায়, সেই মাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পায়। সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই প্রার্থনা করি, অংশ ধর্ম্ম যেন আর না থাকে; সমস্ত মিলিয়া এক হোক। কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটী কোটী সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাই; অনন্তে লীন হই; আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা পাইব। পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না। রূপে যখন মুগ্ধ হই, তখন তুমি বল, বৎস, গুণে কেন মুগ্ধ হও না?

গুণই যদি কেবল ভাবিতে থাকি, তুমি বল, ছেলে হয়ে বুঝি মার গুণ ভাবে? রূপ দেখিতে পারিলে না? দয়াময়ি, চিরকাল এইরূপে লাঞ্ছনাই পাইলাম; যতবার তোমার কাছে গেলাম, সুখ্যাতি আর পাইলাম না। যদি বলি, মা, তোমার গহনা বেশ, তুমি বল, কাপড় ভাল নয় কি? কাপড়ের সুখ্যাতি করিলে, তুমি বল, গহনাকে কেন অনাদর কর? মা, আমি বলিলাম, তোমার ন্যায়-গুণ কি চমৎকার! অমনই অসীম প্রেমস্বরূপ দেখাইয়া বল, প্রেম কি আমার খাট? বিবেককে আদর করিলে তুমি বলিতে থাক, ভক্তি বুঝি ফেল্‌না? মা, আমি কি কর্‌ব বল? আংশিক সাধনে আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পূর্ণতা কিসে পাইব, বলিয়া দাও। অংশ লইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট, আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও কাঁদাও। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ কোথায়, আমাদিগের সকলকে বলিয়া দাও। দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পূর্ণ ধর্ম্ম লইয়া যা কিছু অভাব, যেন দূর করি; পূর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই। মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ত্রিবিধ ভাব।

রবিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

সাধকের জীবন-ধাতু এক জাতীয় নহে, ইহা অল্প বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে লক্ষিত হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর, ইহা কিরূপে জানা গেল? নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াই বুঝিলাম, জীবনের ভিতরে তিন ধাতু আছে। বিবেচনা করিয়া, তিন ভাবের মিলন রাখিয়া যে জীবন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা নহে। অনেক দিন জীবন-প্রবাহ চলিতে লাগিল, পরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম; তখন সিদ্ধান্ত হইল, ইহা এক জাতীয় নয়। জীবন-ধাতু যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তখন জানিতে পারিলাম, কি কি ধাতুতে ইহা গঠিত হইয়াছে। এই জীবনের ভিতরে তিন পুরুষ বর্ত্তমান। তিন প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে; তিন প্রকার ধাতুর একত্র মিলন হইয়াছে। একটী বালক, একটী উন্মাদ, আর একটী মাতাল।

এই তিনের প্রকৃতি যে বিভিন্ন, তাহা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান। এই তিনকে বুঝিতে হইলে, অধিক বিচার বা শাস্ত্রপাঠ করিতে হয় না; সহজেই তিনের স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই তিনের স্বভাবকে আপনার স্বভাবের ভিতরে মিলিত করিয়াছেন। তিনের মিলনে আশ্চর্য্য জ্ঞান, আশ্চর্য্য পবিত্রতা ও আশ্চর্য্য

মুক্তি লাভ করা যায়। তিনের একটী পরিত্যাগ করিলে স্বভাব অপূর্ণ থাকে। যেন ঈশ্বর বলিয়া দিয়াছেন, তিন মসলা একত্র মিলিত না হইলে, ভাল জীবন, সুখী জীবন, ভাল পারবার, সুখী পারবার সংগঠিত হইবে না। নিগূঢ়রূপে প্রত্যেক সাধকের ভিতরে অল্পে অল্পে এই তিন প্রকার মসলা মিশান হইয়াছে। সাধক যত সাধন করে, ততই বালক হয়; যত উপাসনা করে, ততই উন্মাদ হয়; যত নৃত্য গীতের ভিতর গিয়া স্বর্গের আস্বাদ লাভ করে, ততই মাতাল হয়। প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ লক্ষণ ও মাতাল প্রকৃতি লক্ষিত হয়; যতই সাধনে পরিপক্ক হয়, ততই এই সকল গুণ বাড়ে।

বালকের স্বভাব সহজ স্বভাব। এ স্বভাব সহজেই জানা যায়। বালকের স্বভাব হইলে লোকে বৃদ্ধের সহিত মিলিতে অসমর্থ হয়; জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা বালকের অনাস্থা ও অভক্তির বিষয় হয়; ছেলেদের সঙ্গেই থাকিতে ইচ্ছা হয়; খেলার দিকেই মন যায়। যত বুঝিতে পারি, সারল্য সহজ হইতেছে, বৃদ্ধাবস্থা, কুটিলতা, প্রবঞ্চনা বড় অপ্রিয় বোধ হইতেছে, মনের কথা খুলিতে ইচ্ছা হয়, ততহ আপনাকে বালক মনে হয়। যতই বৃদ্ধ হইতে যাই, ততই ম্লানবদন হইতে হয়। বল, বীর্য্য, উদ্যমকে বয়সের সঙ্গে যদি তাড়াই, ক্রমে নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় হইয়া যাই, কার্য্য করিবার ইচ্ছা ক্রমে চলিয়া যায়। এইরূপ যত অনুভব করি, ততই বুঝি, বালক নই, বৃদ্ধ। জীবনবেদ পাঠে প্রতিপন্ন হইল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্য ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে হয় না যে, বয়োবৃদ্ধি হইতেছে। অসত্যমূলক গণিতের অনুরোধে বলিতে হয়, বৃদ্ধ হইলাম; কিন্তু ভিতরে আমাদের দেশের গণিতানুসারে

দেখিতেছি ক্রমে বালকই হইতেছি, ক্রমেই বয়স কমিতেছে। যদি নিতান্তই এ কথা না মান, অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করা উচিত, বয়স বাড়িতেছে না। প্রত্যূষে যখন সাড়ে চারটা বাজিয়া যায়, আর দুই মিনিট হইলে কি দিবস হইল মনে করি? এক মিনিটের তারতম্যে কি ভাবি? কিছুই না। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট, আর পাঁচটা বাজিতে আট মিনিট, এ ব্যবধানকে কি অধিক মনে করি? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, কি ষাট বৎসর পরলোকের লক্ষ বৎসরের কাছে পলক মাত্র। পলক প্রভেদ প্রত্যুত কিছুই নয়।

বালকের বয়স দেড় বৎসর, চার দিন না হয় বাড়িয়াছে, তাহাতে কি হইল? দেড় বৎসরের যে বালক, সেই বালক আমি। কোটী বৎসর কার্য্য করিব যে কার্য্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। এই মাত্র আসিলাম ভবে, এখন সময় হয় নাই মৃত্যুচিন্তার। একটী জীবনে এক বৎসর কি এক শতাব্দী বস্তুতঃ ঘড়ির এক সেকেণ্ড মাত্র। ত্রিশ গেল, চল্লিশ গেল, ভাবিয়া কেন অস্থির হই? এদেশে বলে, আশী বৎসরের বৃদ্ধ গেল; আমাদের দেশের লোকে বলে, দুই বৎসরের বালক চলিয়া গেল। এ দেশে বলে, দৌড়ে গেল; আমাদের দেশে বলে, হামাগুড়ি দিতে দিতে গেল। জীর্ণ কলেবর হইলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। মনের সারল্যেই বাল্যকাল। মনের স্বর্গই স্বর্গ; তাহাই ঈশ্বর রক্ষা করুন। আর এই বাল্যকাল সঙ্গী দ্বারাও জানা যায়। আমি মিথ্যাবাদী—বৃদ্ধ-সঙ্গ যদি আমি কখনও খুজিয়া থাকি। বালকের সঙ্গই আমি চাই, বালককে আমি চুম্বন করি, বালকের মুখের সঙ্গে আমি নিজ মুখ এক করি। বালকের পদধূলি লইতে আমার ইচ্ছা হয়। বালক আমার গোলাপ ফুল;

দেখিলে স্বর্গ মনে পড়ে। বালকদের সঙ্গে থাকব, কেবল এই মনে হয়। যত বৃদ্ধ শ্মশানাভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয়, ইহারা নিজে চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ হইতেছে। জীবনবেদের শ্রোতা কেহ থাক, শ্রবণ কর। মাকে খুব ডাকতে ডাকতে ছেলে মানুষের ভাব আসে। রাজাধিরাজের পূজাই যদি কেবল কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পার। মার পূজা করিয়া কখনও বৃদ্ধ হইলে না; কখনও বৃদ্ধ হইবে না। মার কোলে যতদিন থাকিব, মার স্তন্যপান যতদিন করিব, ততদিন বালকই থাকিব; বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইব; সেখানেও শিখিব, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয় এই মন্ত্র, এই শাস্ত্র।

এই বালকের মসলা ভিতরে; তার সঙ্গে উন্মাদের মসলা। উন্মাদের সঙ্গে কাহারও মেলে না। পৃথিবীর উত্তর, উন্মাদদিগের দক্ষিণ দিক। উন্মাদের সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও গণিত সমুদয়ই নূতন; সমুদয়ই পৃথিবীর বিপরীত। সংসারের লোকের মত হওয়া ঠিক নয়। এইরূপ উন্মাদ হওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত এমন সকল কার্য্য করা চাই, যাহাতে পৃথিবী বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। বিপরীত রকমের কার্য্য সকল দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপা বলিয়া উপহাস করিবে। উন্মাদের বিভিন্ন শাস্ত্র; পৃথিবীর লোকে তাহার কথা শুনিয়া কেবল উপহাস করে; আমাদের দেশের লোকে উহা যত পড়ে, ততই খুসী হয়। পৃথিবীর ক্ষতিলাভ বিবেচনা করিয়া উন্মাদ চলে না; সহস্র বিষয়ে ক্ষতির দিকেই উন্মাদ গমন করে। পৃথিবীর পথে লোকে চলে, উন্মাদ আকাশে চলিতে যায়। উন্মাদ বাড়ী করিবে, কেবল ভাবের উপর। পৃথিবীর লোকে কোটী টাকা

পাইলে ধনী মনে করে, উন্মাদ কিছু না থাকিলেও আপনাকে ধনী ভাবে। উন্মাদকে দেখিলেই হাসিতে হয়। যদি এ জীবনে কিছু হাসিবার বিষয় থাকে, তবেই কৃতার্থ হই। পরিহাসের বস্তু জীবনে পৃথিবী দেখিয়াছে। সেই সমস্ত ভাবই জীবনের সোণাভাগ; উন্মাদের বিপরীত ভাব লোহাভাগ। উন্মাদের মত যতই পৃথিবী ভুলি, ততই সুখের সঞ্চার হয়। যদি দেখ, বুদ্ধি আসিতেছে, তবে ভাবি, ঐ যা, পৃথিবীর লোক হইলাম? কাদের দলে পড়িলাম?

সেয়ানাদের সঙ্গে বসিলে মন কেমন করে। মনে হয়, যেন উঠিতে পারিলেই বাঁচি পৃথিবীর সেয়ানারা যে রাস্তায় চলে, সে দিকে চাহিতে ভয় করে। যে সকল স্থানে তাহারা একত্র হয়, সে সকল জঘন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না; কার্য্যানুরোধে গেলেও উঠিতে ইচ্ছা হয়। পাগল চায় পাগলকে; সেয়ানা চায় সেয়ানাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাগলের কাছে থাক, দেখিবে, পাগল এলোমেলো বকিতেছে। যারা কল্যকার জন্য ভাবিয়া কার্য্য করিতেছে, তাদের দিকে পাগলের চক্ষু যাইতে চায় না। কোন্ দিকে চক্ষু যায়? যে দিকে পাগলের আড্ডা, যে দিকে পাগলাগারদ। যেখানে উন্মাদেরা "ঈশ্বর ঈশ্বর, হরি, হরি" বলিয়া নৃত্য করিতেছে, পাগল সেই দিকেই তাকায়; সেইখানেই যাইতে চায়। বালক নৃত্য করিল আমার ভিতরে; এইরূপ উন্মাদও তাহার সঙ্গে ভিতরে নৃত্য করিল। পাগলামির ভাব খুব পরিপক্ক হইল। বুদ্ধিমানের মত উপাসনা করিলে মনে হয়, ঈশ্বরকে দেখিয়া উপহাস করিয়া হাসিলাম না কি? বুদ্ধিমানের ন্যায়-শাস্ত্র পড়িলে ভাব, এ কি, ঈশ্বরকে ঠকাইতে আসিয়াছি না কি? উন্মাদের মত যে দিন উপাসনা করি, উন্মাদের মত যে

দিন পড়ি, উন্মাদের মত যে দিন নৃত্য করি, যে দিন কাজগুলি উন্মাদের কাজের মত হয়, সেই দিন মনে খুব সুখ হয়। দুই ধাতু মিলিল।

তৃতীয় ধাতু মাতালের আসক্তি। সুরাপানের মত্ততা পৃথিবীতে আছে; আমাদের লক্ষণে তার বৈপরীত্য নাই। কেন? মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়, আমরাও তাই করি। পাঁচ মিনিট উপাসনা ছিল; এখন পাঁচ ঘণ্টা হইয়াছে। একবার ঈশ্বর বলিয়াই তুষ্ট হইতাম, এখন ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিলে তবে তুষ্ট হই; তাহাতেও হয় না, আরও বলিতে ইচ্ছা করে। আগে একবার তাকাইলেই হইত, এখন তাকাইয়া বসিয়াই থাকিতে হয়। তখন এক প্রকার মদে চলিত; এখন গরম মদ খাইতে হয়। এখন মনে হয়, বৃহৎ মাতাল যাঁরা—ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, পূর্ণ মাতলামি করিতেছেন! পৃথিবীতে তেমন নাই; তেমন দরের মদও এখানে প্রায় দেখা যায় না। হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু এ এক দরের; আর ঈশা মুষা যেমন করেন, সে আর এক দরের। ভাবিতে ভাবিতেই সমস্ত জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। জীবন কেবল মাতলামি করিতেই ভালবাসে।

মাতালের আর কি লক্ষণ? যেমন পরিমাণে বাড়াইতে ইচ্ছা দেখা যায়, হৃদয় যত অগ্রসর হয়, মাতালের মত ততই সঙ্গী বাড়াইবার চেষ্টা হয়। অধিক সঙ্গী চাই, দল চাই, কীর্ত্তনভূমি বিস্তৃত করা চাই। এক হাজার লোককে ঈশ্বরের কথা বলিতে পারিলে আগে মন তৃপ্ত হইত, এক হাজার লোকের সঙ্গে কীর্ত্তন করিলেই আগে আনন্দ হইত, এখন ছয় হাজার লোক পাইলেও মন তৃপ্ত থাকে না।

মন আরও চায়। দল কবে হরি বাড়াইবেন, স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। দলে ক্রমাগত সঙ্গী বাড়াইবার চেষ্টা করি। ক্রমাগত যদি সকলে স্বর্গীয় সুধা পান করে, তবেই মনে হয়, জীবনের সাধ মিটিল। যতদিন না একেবারে পূর্ব্ব পশ্চিম পাগল হইয়া যাইতেছে, যতদিন না সকলে স্বর্গীয় সুরাপানে মত্ত হইতেছে, ততদিন এ লোকের এই লাল চক্ষু কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না। একলা মাত্‌লামি হইল না; একশ হাজার লোকের সঙ্গে মাত্‌লামি করিয়াও সুখের শেষ হইল না। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের সঙ্গে মিলিয়া মাত্‌লামি করিতে চাই। বালক হইলে বালক দল চায়; পাগল পাগলের সঙ্গই কামনা করে; মাতাল মাতালকেই খোজে। হরির পাগল, হরির মাতাল কোথায়, তাহাই কেবল খুজিতেছি। আরও বালক হইব, আরও পাগল হইব, আরও মাতাল হইব। স্বদেশের লোক কে কোথায় আছে, খুলিয়া লইব। তিন ধাতুর তিনটী মানুষকে বুকে রাখি, বরণ করি। এই তিন ভাবকে শিরোধার্য্য রত্ন বলিয়া বহুমূল্য জ্ঞান করি। যতদিন বালকত্ব আছে, পাগলামি আছে, প্রমত্ততা আছে, ততদিনই সুখ ও পবিত্রতা। যে দিন বৃদ্ধ হইব, পাগলামি ছাড়িব, উন্মাদ অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা ছুটিয়া যাইবে, সেই দিনই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ভগবান্ করুন, যেন এ তিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনও না হয়।

হে দীনবন্ধু, হে করুণার অনন্ত সমুদ্র! কি সুখ হয়, যদি তোমার কোলে গিয়া বসিতে পারি। অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, ধর্ম্ম করিয়াছি, ভাবিলে অপরাধ হয়। কিছু হয় নাই, মার কোলে থাকিব, এই কথা যত মনে রাখি, তত সুখ হয়। বুড় হওয়া দূরে

থাকুক, তোমার কোল হইতে আর কেহ যদি কোলে নিতে আসে, ভয় হয়। বৃদ্ধ দেখিলে আমার ভয় করে। আমি মা ভিন্ন আর কিছু চিনিলাম না, এই জ্ঞান মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, সুখপ্রদ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বৃদ্ধি হোক্, এই প্রার্থনা। মা, কেবল তোমার স্তনদুগ্ধই যেন খাই। পৃথিবীতে আসিয়াই আমি অন্ন খাইতে পারিব না, মাংস খাইতে পারিব না। বয়স হয় নাই; দাঁড়াইতে পারিব না। মা, তোমার কোলে থাকিব। শক্ত জিনিস খাইতে পারিব না। দয়াময়ি, তোমার পূজা করিতে করিতে যত স্তন্যদুগ্ধ পান করিলাম, বাল্যাবস্থায় যত সুখ পাইলাম, ততই আমার পাগল আর মাতালের ভাব হইতে লাগিল। মনে হইল, ধুতরা আছে, কি মদ আছে, মার স্তনের দুগ্ধ খাইলে যেন শিশুর আবল্য ধারণ করে। যতবার তোমার দুগ্ধ টানিয়াছি, মা, ততবারই বিভোর হইয়াছি। সাদা চক্ষে যদি বক্তৃতা করিতে যাই, ভুল হয়। সাদা চক্ষে সাধন করি, হয় না। নেশা হলে, এ সব বেশ হয়। দয়াময়ী, দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তোমার স্তনদুগ্ধ মুখে আসে, ধুতরার মত কি এক পদার্থ তুমি দুধের সঙ্গে মিশাইয়াছ, তাই খাই, আর পাগল হই। কত এলোমেলো বকি, কত মাত্‌লামি করি। মা, এতেই আমি সুখী থাকি। এই পাগলামি মাত্‌লামি ভাল। পৃথিবীর জ্ঞানী হইতে চাই না। বালক করিয়া রেখো; বৃদ্ধ যেন কখনও না হই। মাথার চুল যদি পাকে, ক্ষতি নাই; আত্মার বার্দ্ধক্য যেন না হয়। দোহাই, ঠাকুর, বালক থাকা বড় সুখের। প্রাণের ভিতর গোলমাল নাই, শিশুর মতন উপাসনার সময় সহজ কথা কহিব। আঁকাবাঁকা চাই না; কুটিল হলে সুখ হবে না। বৃদ্ধের বিষ বালক অঙ্গে প্রবেশ

করিতে দিও না। তুমি, মা, আমায় হাতে কোরে দোলাবে, মুখ চুম্বন করিবে, এই চাই। ব্রহ্মমন্দিরের প্রার্থনা শোন; আমাদের কোলে তুলে আদর কর। কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল বালক থাকিব, পাগল, মাতালের প্রকৃতি লইয়া বাস করিব। যে কিছু বার্দ্ধক্য সঞ্চয় করিয়াছি, পরিত্যাগ করিয়া যেন বালক হই। দয়াময়ি, তোমার ধর্ম্মরস পান করিয়া খুব উন্মত্ত অবস্থা লাভ করিব, বালকের মত, পাগলের মত নাচিব, নাচিতে নাচিতে স্বর্গে প্রবেশ করিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বারবার নমস্কার করি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জাতি-নির্ণয়।

রবিবার, ৩রা পৌষ, ১৮০৪ শক ; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

যদি মানবমণ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায়, আমি আমাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত মনে করিব? হে আত্মন্, তুমি কোন্ জাতীয়? ধনীর সন্তান, কি দীনের সন্তান? ধনবানের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কি দরিদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত, এ জীবনে অনেকবার এ কথা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে। এ কথার মীমাংসা জীবন-বেদের একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ। ইহা জানা আবশ্যক, আত্মা কোন্ জাতিতে জন্মিল। কি প্রকার স্বভাব; রুচি ও অভিপ্রায় কোন্ জাতির মতন; স্বভাবতঃ কোন্ দলে মিলিতে ইচ্ছা; কার্য্যপ্রণালী কাহার ন্যায়; স্বভাবতঃ ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বাগ্রেই জানিতে ইচ্ছা করে, আমি কোন্ জাতীয় মানব। অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে, মনের কামনা, অভিরুচি তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্রজাতীয়। শরীরের রক্ত দুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তিষ্ক দীন জাতির মস্তিষ্ক। যাহা কিছু আচার ব্যবহার দৈনিক, প্রচুর পরিমাণে তাহাতে দরিদ্রতাই লক্ষিত হয়। অনুমান দ্বারা যদি এ কথার সিদ্ধান্ত করি, কথা মিথ্যা হইবে; বেদ হইতে মহাপাপ হইবে। মনের গভীরতম রুচি অনেক বৎসর হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে অনৃত বচন

নাই, ভ্রান্তি নাই, অনুমানের কথা নাই। অনেক বিচারে পরীক্ষিত হইয়া, দীন বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছি।

যদিও উচ্চকুলোদ্ভব, যদিও নানাপ্রকার ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন আছে, কিন্তু ধনের প্রয়াস নাই; উপাদেয় আহার্য্য আছে, কিন্তু আহারস্পৃহা নাই; মন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট। মান মর্য্যাদা চারিদিকে আছে, কিন্তু মন সে সকলের খবর লয় না। দুই দলের লোক আসিলে ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোজ লয়; দরিদ্র-সহবাসে মন পরিতৃপ্ত বোধ করে। এই সমস্ত দেখিয়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মন কোন্ জাতীয়। এই পরীক্ষা বিচারককে ভ্রান্তিতে আনিতে পারে না; ইহাতে ভুল হইতে পারে না। কেন না, বিশেষ অবস্থায় পরীক্ষা হইয়াছে। হৃদয় যদিও দীন, বাহ্য উপকরণ ধনাঢোর। শীঘ্রই এ অবস্থায় আত্মাকে পরীক্ষা করা যায়। ধনীর অট্টালিকায় না জন্মিয়া যদি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিতাম, তাহা হইলে পরীক্ষা করা কঠিন হইত। মনের ভিতর হয় ত ধন সম্পদের উষ্ণতা থাকিত। হয় ত কেবল বাধ্য হইয়াই গরিবের চালে চলিতাম। বাহিরে ধনীর ভাব, ভিতরে আছে কি না, ইহা দেখা উচিত। যখন ধন পরিত্যাগ করিয়া মন দারিদ্র্য অন্বেষণ করে, তখন বুঝিতে হইবে, দরিদ্রতা মনের স্বাভাবিক ভাব; মন দরিদ্র জাতীয়।

ধনাঢ্য পিতা পিতামহের দ্বারা পালিত ও বাহিক ঐশ্বর্য্য সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও মন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক দৈন্যের পরিচয় দিতে লাগিল। সামান্য আহারে মন তৃপ্তি বোধ

করে; দৈন্যসাধন ইহার স্বভাবসিদ্ধ। বহু কষ্টে দীনতা সাধন করিতে হয় না, শাকান্নেই আমি লোভী। আসক্তি যদি কোন পদার্থে থাকে, তবে সে পদার্থ শাক। এ কথা আমার জীবনে অতি অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ করে। ইহাতে অন্যের মনোরঞ্জন না হউক, আমার পক্ষে ইহা অতি চমৎকার বিষয়। হৃদয় স্বভাবতঃ শাকেতে এত তৃপ্তি বোধ করে, এত সুখ আরাম পায়, এত তৃপ্তি এবং আনন্দ মন এই সামান্য বস্তুতে দেখিতে পায় যে, তাহাতেই বুঝিলাম, আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। বাষ্পীয় শকটে যদি কোন স্থানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি অনধিকার চর্চ্চা করিতেছি; ভয় হয়, বুঝি ধনীর রাজ্যে যাইতেছি। সমস্ত সময় উদ্বিগ্ন হইতে হইবে, বিজাতীয় ভাব ও বস্ত্র সকলে মনের তৃপ্তি অন্তর্হিত, শান্তিরসের ভঙ্গ হইবে। মন পলকের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে, প্রথম ছাড়িয়া দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। সিদ্ধান্ত করিতে কালবিলম্ব করা সম্ভব নয়; আরামের জন্য দুঃখী দরিদ্রদের আধারের দিকেই মন যাইতে চায়।

যদি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হয়, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধে হইতে পারে; কিন্তু স্বভাবকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "সুখ ঐস্থানে; উদ্বেগবিহীন যেমন তৃতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী তেমন নয়।" এই যুক্তিতেই বুঝা যায়, আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। যেখানে দরিদ্রেরা, সেখানেই আমার আরাম; জীবন রক্ষা সেইখানেই। আয়াস দ্বারা এ সকল দরিদ্র ভাব শিক্ষা করি নাই; আপনা আপনি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রাস্তায় যদি চলিতে হয়, দরিদ্রের মতই চলি। নগর কীর্ত্তনে দুঃখীদের মত

চলিতেই হইবে, কে বলিল? এ যে দুঃখীর লক্ষণ; কাহার নিকট ইহা শিক্ষা করিলাম? ভাবিলাম না, ধনীরা ইহাতে কি বলিবেন। সংবাদ পত্রে হয় ত পরিহাসসূচক কথা বাহির হইবে, মানহানি হইবে, জানিয়াও কেন ইহা করিলাম? কেন করিলাম, তাহা চিন্তা করিলাম না; উহা যে চিন্তার বিষয়, তাহাও মনে করিলাম না। কিন্তু বিনামা পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি চলিলাম। তোমাকে শিখাইলাম না, হে আত্মন্, অথচ দরিদ্রতা শিখিলে। কুটীরে রাখিলাম না; স্বভাবতঃ ধূলির মধ্য দিয়া হৃদয় চলিতে চাহিল। এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। পৃথিবী বুঝুক, আর না বুঝুক, আমি ঠিক বুঝিয়াছি, আত্মা দীনের আত্মা, মনটা দুঃখীর মন, শরীরটা দুঃখী দরিদ্রের শরীর। সকল বিষয়েই দৈন্য দারিদ্র্যের লক্ষণ প্রকাশিত।

বড় ধনীদের সঙ্গে বসি? বড় লোকের করস্পর্শ করি? এ সকল করিলেই কি স্বভাব যাইবে? চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণস্পর্শে ব্রাহ্মণ হইবে? শাকান্ন-ভোজী একদিন সম্রাট-গৃহে আহার করিলেই কি ধনী হইবে? এ স্বভাব কিছুতেই যাইবে না। এই জন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া নিরাপদ আছি। জাতি টের পাইয়াছি। কে কে এই জাতির লক্ষণযুক্ত, ইঙ্গিতে বুঝিলাম, ইসারায় নিরূপণ করিলাম। কিন্তু একটা কথা আমার শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাও বলা উচিত। যদিও নির্ধন দীনদের সঙ্গে আমি আছি, যাহাদের ছিন্ন বস্ত্র, গরিব যারা, যদিও তারাই আমার প্রাণের বন্ধু, অন্নে তুষ্ট যারা, যদিও তাহারাই আমার প্রাণের সখা, তথাপি আমি সে কথা শিক্ষা করিয়াছি। কথিত ছিল, ধনীকে ঘৃণা করিয়া

হীনকে মান্য দিবে; পরাক্রমশালীকে অগ্রাহ্য করিবে; পরিত্রাণের পথে ধনীরা যাইতে পারে না। মান সম্পদ গৌরব যেখানে, সেখানে ধর্ম্ম নাই; পর্ণকুটীরেই কেবল ধর্ম্ম বাস করেন। কিন্তু এখনকরা শাস্ত্রে নববিধানের মতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ধনীকে মান দিবে, এবং দুঃখীকেও মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী দুঃখী উভয়েই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই, মনে দুঃখী হইলেই হইবে। বাহিরে ধন আছে বলিয়াই কি একজন স্বর্গের পথে চলিতে পাইবে না? দুঃখীকে কাছে টানিবে, ধনীকেও কাছে টানিবে। পক্ষপাতশূন্য হইয়া দুই জনকেই প্রেমদান করিবে।

নববিধানের নব কথা, নব উপদেশ। ধর্ম্ম যিনি, তিনি রাজ-প্রাসাদে, তিনি পর্ণকুটীরে। ভক্ত যিনি, তিনি নবাবকে প্রেমালিঙ্গন দেন, সামান্য চণ্ডালকেও প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করেন। প্রেমিক নর-পতির কাছে যেমন, দুঃখীর কাছেও তেমনই। তাঁর কাছে ধনী ধনী নয়; দরিদ্রও দরিদ্র নয়; মনুষ্য হইলেই তিনি প্রেম দেন। এই কথাই আমার হৃদয়ে প্রবল হইল; হইবারও কারণ আছে। যদিও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম, আমি দীন হীন, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ধনীদের মধ্যে জন্ম, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস দাসী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান। উত্তরে দক্ষিণে কেবল ঐশ্বর্য্যেরই ব্যাপার। ভিতর বাহিরে যুদ্ধ হইতে লাগিল। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন চণ্ডালের ঘরে জন্মিলাম না? যেখানে দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া নাই, সেখানে কেন আমার জন্ম হইল না? দুঃখীকে কেন ভগবান্ ধনীদের সঙ্গে দিলেন? বাল্যকালে ধনী বালকদের সঙ্গে ও যৌবন

সময়ে কেন ধনী যুবাদের সঙ্গে বেড়াইলাম? বয়স বাড়িলে উচ্চ বিদ্যা শিক্ষার্থ উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন যাইতে হইল? ঈশ্বর জানিতেন, তাহার ভিতরেও গভীর অর্থ আছে। সে সকল কি জন্য হইয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই।

দীন জাতীয় হইয়া যদি দীনের ঘরে থাকিতাম, দীন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয় ত দীনদিগেরই পক্ষপাতী হইতাম; ধনীর মস্তকে হয় ত কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম। কে বলিতে পারে, যে দীনগৃহে থাকিলে নিরপেক্ষ হইতাম? প্রাণেশ্বর ধনীর ঘরে জন্ম দিলেন; ধনীভূত দৈন্য অন্তরে, লক্ষ্মীর প্রকাণ্ড সংসার চক্ষের সমক্ষে রাখিলেন। বাহিরে ঐশ্বর্য্য থাকিলেও চক্ষু বন্ধ করিয়া নির্ধনের ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। এই দ্বিজাতীয় ভাবের মধ্যে থাকিয়া সহস্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম। ধনীর পক্ষপাতী হইলাম, দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম। সকল প্রভেদ ভুলিলাম; বর্ণভেদ জাতিভেদ ভুলিয়া সকলকে প্রেম দিলাম। এখন দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নববিধানে ধনীকে আনিতেছি, পরিব্রাজক সর্ব্বত্যাগী অতি দীনকেও আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছি। এক পার্শ্বে ধনী বিদ্বান্‌কে বসাইতেছি, আর এক পার্শ্বে দীন দুঃখীকে আসন দিতেছি। পুস্তক পড়েন যিনি, তাঁহাকে আনিতেছি। যিনি পুস্তক না পড়েন, তাঁহাকে আনিতেছি। সকলেই আসিয়া প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ করিতেছেন; সকলেই আসিয়া নব-বিধানের ঘর পূর্ণ করিতেছেন।

আজ কি সুখের দিন! ভাগ্যে দ্বিজাতীয় স্বভাব দেখিলাম। উচ্চ জাতীয় নীচ জাতীয়, বিদ্বান্ জাতীয় মূর্খ জাতীয়, এই দ্বিজাতির

সন্ধিস্থলে ভাগ্যে জন্মিয়াছি। এই জন্যই এখন বলি, 'হে দয়ালু, ধনীর ধন আছে বলিয়াই কি তোমায় পাইবে না? পণ্ডিত সংস্কৃত পড়িয়াছেন বলিয়াই কি তোমার গৃহে আসিতে পাইবেন না? যিনি কিছু মাত্র বিদ্যা অর্জ্জন করেন নাই, তাঁহাকে কি তুমি তাড়াইয়া দিবে?' নববিধান বলেন, সকলেরই জন্য ঈশ্বরের গৃহ প্রসারিত। হও দুঃখী; কিন্তু আকর্ষণ করিয়া সকলকেই ঈশ্বরের গৃহে আনয়ন কর। বলিতে বড় ইচ্ছা হয়, অন্তরে এই যে দীন জাতীয় ভাব, ইহা হইতে অনেক উপকার হইল। এই দীনতার জলে অহঙ্কার-আগুন নিবাইয়াছি; ধন বিদ্যার গৌরব তাড়াইয়াছি। শান্তি লাভ করিলাম, এই জলে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বড় ঘরে যাই, ধনীর কাছে যাই, আচার ব্যবহারে বড় পরিবারে আবদ্ধ হই; তথাপি জানি, আমি হীন, চিরহীন; নীচ, অতি নীচ। নিজে হইলাম দীন, মান দিলাম দুঃখী ধনী উভয়কেই; প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলাম। নিজে দীন দরিদ্র জাতীয় থাকিলাম, ইহাতেই সুখ, শান্তি; দীনাত্মারই পরিত্রাণ।

হে দীনবন্ধু, হে করুণাময়, পৃথিবীর উচ্চপদ পাইয়া মন কত সময় অহঙ্কারে গর্ব্বিত হয়; ধন মানের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় কত সময় বিচলিত হয়। কিন্তু হে ঈশ্বর, জন্ম হইতে, বাল্যকাল হইতে যাহাকে দীনতায় স্থির করিয়া রাখ, অহঙ্কার কিরূপে তার কাছে স্থান পাইবে? আমি দীন জাতীয় বলিয়া দীনদের দলে কত ফল লাভ করিলাম, দীনদের সঙ্গে নগর-কীর্ত্তনে কত মাতিলাম। অনেক ধন মানের মধ্যেও প্রচুর ফল লাভ করিলাম। যদি বড় মানুষের জাতীয় হইতাম, বড় পাপ করিতাম। সামান্য শাকান্নে যদি আসক্তি না থাকিত, হে দীনহীনগতি, আমি তাহলে তোমায় চিনিতাম না;

বেদীতে আজ বসিতাম না। তুমি দেখিলে, সন্তানকে ধনী জাতীয় করিলে সে ধনের গরমে মরিবে; তাহাকে দীন জাতীয় করা উচিত। বিপদ জানিয়া, অহঙ্কার, মৃত্যু বিনাশ করিবে দেখিয়া, দয়াসিন্ধু, তুমি বলিলে, সন্তানকে দুঃখীর মন দিই, গরিবের আত্মা দিই, রুচিগুলি দুঃখীর মত করিয়া দিই। দীন জাতীয় হইয়া, আসিয়া অবধি কত সুখই পাইলাম; সকলেরই কারণ দেখিলাম, এই দৈন্য। দৈন্য স্বভাব আমার পক্ষে অভিসম্পাত না হইয়া আশীর্ব্বাদ হইল। এত বিপদ মস্তকের উপর দিয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। উচ্চ পদে কত উঠিতেছি, কত উচ্চ লোকের করস্পর্শ করিতেছি, ধনের উষ্ণতা বোধ করিতে হইল না। ব্রাহ্মদলের মধ্যে আমার কাছে যত প্রলোভন আসিয়াছে, এত যে কাহারও কাছে আসে নাই; পরীক্ষা যে কাহারও হইল না। আমার সংসারের ভিতরে রাজার সংসার আসিয়াছে, মান্য অনেক দূর উঠিয়াছে, কিন্তু জাতি আমার গেল না। তোমার প্রতি মতি থাকাতে বড় তুফানের ভিতরেও মরিলাম না। আমি নাকি সেই মাদুরই প্রস্তুত করিতেছি, জাতীয় স্বভাবে গুড় বেচিয়া নাকি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছি। সামান্য ছোট সঙ্গই নাকি খুজিতেছি, তাই বাঁচিয়া গেলাম; নতুবা ধন সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া মারা যাইতাম। বুঝিলাম, তুমি যাকে বাঁচাও, তাকে মারে কে? ঠাকুর, দীনতা আমার পরিত্রাতা। এখন তোমার কাছে থাকিয়া ডাকিতেছি; ধনীকে ডাকিতেছি, ধনী, এস; গরিবকে ডাকিতেছি, ভাই, তুমিও এস। ধনীর সংসারে ছিলাম, ধনীরা ডাকেন, সেখানে যাই; বড় মানুষকে ভালবাসি; রাজা রাণীকে ভালবাসি; মহারাণীকে ভক্তি দিই, বিদ্বান্‌দেরও ভক্তি দিই। এখন ধনীর সঙ্গে

মিশিলেও ভয় আর নাই। সিদ্ধ হলে আর ভয় থাকে না। হে দীনবন্ধু, ধর্ম্মের শান্ত ভাব, দীনতার ভাব সকলকে দাও। দুঃখী আমরা যথার্থ ই। আমাদিগের নববিধান যে দুঃখীদের বিধান। আমরা দুঃখীর মত রাস্তায় চলিব, ধূলি হইয়া যাইব, দন্তে তৃণ করিব, তবে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইব। কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকলেই দীনাত্মা হইয়া, পৃথিবীতে যে পবিত্র স্বর্গীয় সুখ, তাহাই সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শিষ্যপ্রকৃতি।

রবিবার, ১০ই পৌষ, ১৮০৪ শক; ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

এই পৃথিবী ব্রহ্মবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিতে হইবে, ধর্ম্মোপার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই; শিক্ষক বলিয়া কখনই আপনাকে বিশ্বাস করিব না। শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। শিখধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্ম শিক্ষা করা, আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই ভাব হইতেই জীবনতরু দিন দিন সবল ও সতেজ হইতেছে; শোণিতের মধ্যে সেই ভাব দিন দিন প্রবল হইতেছে। শিক্ষা করিয়াছি, শিক্ষা করিতেছি, প্রবল কামনা আছে, চিরকালই শিক্ষা করিব। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন সময়ে শিক্ষা করিয়া থাকি, সম্পদে বিপদে ধর্ম্মগ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করি। প্রাণী মাত্রই আমার গুরু, বস্তুমাত্রই আমার শিক্ষক, মনুষ্যপ্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি। চক্ষু খুলিলে বিদ্যালয় দেখিতে পাই, চক্ষু বন্ধ করিলে আরও প্রকাণ্ড বিদ্যালয়। শিক্ষা করিবার স্পৃহা যেমন আমার, শিক্ষার বস্তুও তেমনই অপর্য্যাপ্ত। বিবিধ সত্য, পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান চারিদিকে বিবৃত রহিয়াছে। গ্রন্থাভাব আমি কখনই দেখিলাম না; শিক্ষার যে কোন দিন বিরাম হইবে, এ কথা বিশ্বাস করিলাম না। শিক্ষাই আমার ব্যবসায়, শিক্ষাতেই জীবন; সুখ শিক্ষাতে,

পরিত্রাণ শিক্ষাতে। শিক্ষা করিয়া করিয়া এত সত্য ধন পাইয়াছি, বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন মনে হইতেছে, আরও কত ধন প্রাপ্ত হইব। কখনও আমার মনে হইল না যে, শিক্ষার শেষ হইয়াছে।

কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী গুরু, মৎস্য গুরু, সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। কর্ত্তব্যবোধে যে ইহা করিয়াছি, তাহা নয়; ধর্ম্মানুরোধেও ইহা হয় নাই। ইহার জন্য স্বভাব উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই আমার সুখ হয়। আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া আবিষ্কর্ত্তার মনে যত না সুখ হইয়াছিল, কোন চমৎকার বস্তু দর্শন করিয়া দর্শকের যত না সুখোদয় হয়, বোধ হয়, তদপেক্ষা আমার গভীর সুখ হইয়া থাকে, যখন আমি ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধে কোন নূতন সত্য লাভ করি। আনন্দ হয় আমার মনে কখন? যখন আমি কোন সত্যকে ধরিতে পারি। নিজ বুদ্ধিতে কখনও আমি সত্য লাভ করি নাই; বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া, এক একটী করিয়া সিদ্ধান্ত করা আমার ব্যবসায় নয়; এ শিক্ষা আমার নয়। ঘোরান্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়। কোন বস্তু দেখিতেছি, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকাইয়া আছি, কে যেন আমার নিকট সত্য আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটী সত্য আসিল, অমনই হৃদয় বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইল। মনে ধাক্কা দিয়া এক একটী সত্য আসিয়া থাকে। কত সত্য আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহু সত্যের আবিষ্কার হইয়াছিল, মিলাইয়া দেখিয়াছি, তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ নূতন।

নিত্য নূতন সত্য লাভ করিয়াছি; লাভ করিবা মাত্র মনে সন্তোষ ও শান্তির উদয় হইয়াছে। হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দেখিলাম, আনন্দময়ী জননী অধ্যাত্মরাজ্যে ভক্তদিগকে এইরূপে সত্য দান করেন। যেই একটী সত্য প্রকাশিত হয়, জীবনে বিশেষরূপে উপকার করিয়া থাকে।

সত্য প্রকাশে বুদ্ধি যেমন চরিতার্থ হইল, পুণ্যে সেইরূপ জীবন সুশোভিত হইল। বিশেষ কথা এই, সত্য লাভে আমার প্রভূত আনন্দ হয়। আনন্দ না হইলে কেহ শাস্ত্রব্যবসায় গ্রহণ করে না। জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া আমি কি শাস্ত্রব্যবসায় লইয়াছি? নির্দ্দিষ্ট পাঠে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আমি সিদ্ধ হইয়াছি, অধ্যাপক হইয়াছি, এ কথা কি বলিব? গুরুর নিকট যাহা শেখা উচিত, তাহা শেষ হইয়াছে, এ সেবকের মনে এ ভাব কখনই হইল না। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে যখন উপদেশ দিয়াছি, তখনও এ ভাব মনে হয় নাই, ব্রহ্মমন্দিরের সম্মানিত স্থান পাইয়া আজও তাহা মনে হইতেছে না। শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা কখনও মনে আসে নাই। যখন পড়িয়াছি, তখন এ ভাব মনে হয় নাহ; যখন পড়াইয়াছি, তখনও হয় নাই। যখন শিখিয়াছি, তখন আমি শিষ্য; যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিষ্য। পাঁচ জনের সঙ্গে সাধন করিয়া তত্ত্ব সঞ্চয় করি; হৃদয়ের মধ্যে সত্যরত্ন পাইলেই আহ্লাদ হয়। মনে হয়, সৌভাগ্য বশতই মেদিনীতে আসিয়াছি; মনুষ্যজীবন সৌভাগ্যের জীবন। শিক্ষা করিলে যত আনন্দ হয়, দিলে কি তত আনন্দ হইয়া থাকে? সত্য লাভ অপূর্ব্ব আনন্দের হেতু। সত্যের সঙ্গে আত্মার একটী সম্বন্ধ আছে: সত্য পাইলেই

মনে হয়, আমি একটী নূতন জগৎ অধিকার করিলাম, অধ্যাত্ম-রাজ্যের এক প্রকাণ্ড সম্পত্তি আমার হস্তগত হইল। যার সুর বোধ আছে, সে তানপুরা কি সেতার লইয়া, ইংলণ্ড দেশীয় কি ভারতবর্ষীয় কোন যন্ত্র লইয়া, সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে, যদি নূতন একটী সুর আবিষ্কার করিতে পারে, তবে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। সুরসিক হৃদয়ে কি আনন্দেরই সঞ্চার হয়। আমার গলার অস্থির মধ্য হইতে নূতন সুর আসিল, সরস্বতী আমার নিকট একটী নূতন সুর প্রেরণ করিলেন, ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যক্তি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যায়।

নূতন রত্ন লাভ করিলে বস্তুতই হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সামান্য ধীবর নদীতে মাছ ধরিতেছে। রোজ রোজ অধ্যবসায় সহকারে মাছ ধরিয়া যদি সেই পুরাতন পোনা কিম্বা রুই মাছ প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবনের উপকার হয়, পরিশ্রম সার্থক হয়। তাহা ভিন্ন আর কোন সুখ হয় না; কিন্তু একদিন সোমবার প্রাতে যেমন জাল ফেলিয়াছে, পুরাতন জাতীয় মাছের পরিবর্ত্তে যাহা কখনও দেখে নাই ও শোনে নাই, এমন এক নূতন জাতীয় মৎস্য যদি দেখিতে পায়, আনন্দের শেষ থাকে না। তাহার শরীরের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আনন্দতড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। যিনি চিত্র করেন, যাহা শিক্ষকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই আকার প্রকার, সেই লক্ষণ যেমন শিখিয়াছিলেন, তেমনই উৎপন্ন করেন। চিত্র করিতে করিতে যদি নূতন বর্ণ বাহির হয়, নূতন কোন ভাব ব্যক্ত হয়, নূতন লক্ষণ চিত্রে চিত্রিত হয়, "ধন্য আমার স্রষ্টা, ধন্য পৃথিবী" বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ করিয়া

চিত্রকর নিজ সৌভাগ্যের পরিচয় দিতে থাকেন। যাহা শিখি নাই, তাহা কিরূপে হইল? কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইল? এই ভাবিয়া চিত্রকর বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করেন। চিরকাল গ্রহ নক্ষত্র দেখিয়া আসিতেছেন, এরূপ জ্যোতির্ব্বিদ্ কখন্ আনন্দ প্রাপ্ত হন? যখন সেই পণ্ডিত, সেই বিজ্ঞানবিৎ নভোমণ্ডল দেখিতে দেখিতে একটী নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করেন, তখন তিনি চারিদিকে আপনার হৃদয়ের অতুল আনন্দ ঘোষণা করিতে উদ্যোগী হন। কোটী টাকা পাইলেও লোকের সেরূপ আনন্দ হয় না; সম্রাটের সিংহাসন লাভ করিলেও তত আহ্লাদ হওয়া সম্ভব নহে। তিনি মনে করেন, আমি যে আজ নূতন নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে দর্শন করিলাম, আমি যে একটী নক্ষত্রকে আবিষ্কার করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমার পরম সুখ। নূতন নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া জ্যোতির্ব্বিদের যত সুখ, নূতন সত্য লাভ করিলে আমার ততোধিক সুখ ও আনন্দ সঞ্চার হয়।

কে ধনী হইবার কামনা করে, কে নৃপতি হইতে চায়? ব্রহ্মপ্রসাদে যদি নূতন সত্য সমাগত হয়, তবে সেই সত্য লাভ করার ন্যায় আর কিছুতেই সুখ নাই। শিষ্যপ্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়াই আমি সেই জন্য আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছি। বিদ্যালয়ের ন্যায় এখনও ছাত্রের ব্রত দেখিতেছি। চারি বেদ কখনই পড়া হইল না; শিষ্যত্ব আর ঘুচিল না। প্রকাণ্ড হিমালয় ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতার পরিচয় দিতেছে। জ্ঞান যে শিক্ষা করিয়া শেষ হইবে না, চারিদিকেই তাহার নিদর্শন দেখিতেছি। কি সাধারণরূপে, কি বিশেষরূপে, দুই রূপেই দেখিতেছি, জ্ঞানের শেষ নাই। কি ভক্তি সম্বন্ধে. কি ব্রহ্মদর্শন

বিষয়ে, শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-প্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি, তথাপি ফুরাইল না। গুরু যার জাগ্রত জগদ্গুরু, তার শিক্ষার অন্ত কি? সামান্য গুরুর নিকট ছাত্র হই নাই। আমার গুরু জগদ্গুরু। তিনি কেবলই শিখাইতেছেন; যতই শিক্ষা করি, ততই অহঙ্কার চূর্ণ হয়। চল্লিশ বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি শেখা আর সম্পূর্ণ হইল না; কত প্রার্থনা-তত্ত্ব শিখিলাম, তথাপি শেখা হইল না; দয়াল নাম কেমন করিয়া করিতে হয়, আজও সম্যক্ জানা হইল না। ভালবাসার শব্দার্থ কি? প্রেম মানে কি? জানিয়া শেষ করা হইল না। সেই জন্যই আপনাকে ধিক্কার করি। যেই ধিক্কার করি, অমনই সত্য শিক্ষা করি। ধন্য আমি, এইরূপে অনেক সত্য শিখিয়াছি। ধন্য আমি, এখনও সেইরূপ শিখিতেছি; এখনও আমি শিক্ষক হই নাই।

শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল স্বার্থপরের ন্যায় থাকিব? জ্ঞান লাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরবদ্ধ থাকিবে? 'গ্রহণ-মন্ত্র' সাধন করিলাম, 'প্রদান-মন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূল মন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে, সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুইটী দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি, আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানি হয়। আসে এক পথ দিয়া, যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারগুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়; শতগুণ হইয়া আবার আসে।

মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরও অধিক হয়। সত্য লাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ। কিরূপে সত্য দিব, একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার; তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই; পুরাতন কথা বলি নাই। গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, এ বৎসরেও যে তাই বলিব, তাহা নহে। দিবার জন্য আসি নাই, বুঝিতে পারিয়াছি। আসিয়াছি শিখিতে; শিক্ষিত বিষয় আপনা আপনি প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসর যাহা বলা হইয়াছে, এ বৎসর যদি তাই বলা হয়, কাল যে প্রার্থনা করিয়াছি, আজও যদি তাই করি, কাল যে বক্তৃতা করিয়াছি, সেই বক্তৃতা যদি পুনরায় করি, মনে হইবে, অসার গুরুগিরি করিতেছি, ভ্রূকুটি ভঙ্গী করিয়া বুঝি পাঁচ জনের মন হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। পুষ্করিণী বুঝি শুকাইয়া গিয়াছে, লোককে বুঝি কাদা দিতেছি, কাদাও বুঝি আর নাই, শুষ্ক মাটিই দেখিতেছি। এ কথা কিন্তু আমাকে বলিতে হইল না; এ আক্ষেপ আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না। দীননাথ আর পাঁচ প্রকারে যেমন উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও তেমনই উপকার করিয়াছেন। কিছু নাই, কি বলিব, কি লিখিব, এ চিন্তায় কোনও দিন চিন্তিত হইতে হইল না। কল্যকার দিনকে অদ্যকার দিন করিব? পুরাতন ইতিহাসকে বর্ত্তমান করিব? চর্ব্বণ করিয়া পুনরায় সেই বস্তু লইয়া চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিব? ছি! ছি! আমার গুরু এ কথা শুনিলে

অসন্তুষ্ট হন। সেই জন্য চর্ব্বিত বস্তু কখনই চর্ব্বণ করিতে হইল না; কাদা ঘাঁটিতে আমাকে হইল না। কি দিলাম, কি শিখাইলাম, সে দিকে দৃষ্টি হয় না; কি শিখিলাম, কেবল তাহাই দেখি। ইহাতেই আমি বাঁচিয়া গেলাম। ভাল কথা পাঁচ জনকে শুনাইতেছি, ইহা মনে হইলেই জিহ্বা জড়াইয়া যায়, বাক্‌রোধ হয়, শরীর মন সঙ্কুচিত হয়। আমি শিখিলেই শিখান হইল; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল। শরীর হইতে শ্রোতার শরীরে সত্য-লাভের বল ও প্রভাব সঞ্চারিত হয়। আমার আত্মায় সত্য আসিলেই সত্য অন্যের হইবে। আমার নিকট সত্য ঘোষিত হইলে, নিশ্চয়ই সেই সত্য শঙ্খ ঘণ্টা সহকারে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

ভারতের পানে চাহিয়া দেখিয়াছি, আমি শিখি যাহা, ভারত শেখে তাহা। যেন পাখীতে ঠোঁটে করিয়া সকলের ঘরে সত্য বহন করিয়া দিয়া আসে। আমার হৃদয় যেন প্রণালী দ্বারা ভ্রাতৃহৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা যেন আমার হৃদয়ের সত্য সর্ব্বত্র সর্ব্বহৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। আমার মনে সূর্য্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইলেই, সেই জ্যোতি সকলকে জ্যোতিষ্মান্ করে। ধনাঢ্যের প্রাসাদে যেমন, দরিদ্রের কুটীরেও তেমনই সত্য সঞ্চারিত হইতেছে, শুনিতে পাই। ধন্য জগদীশ্বরকে, একজনের নিকট সত্য গিয়া, সেই সত্য দশ সহস্র লোকের মনে প্রকাশিত হইতেছে। সত্য আমরা কেবলই শিক্ষা করিব; চিরদিনই শিখি, এই কামনা। যে কেউ হউক না, তাহারই নিকট শিখিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য গায়ক দেখিলে, তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালবাসি। কোন বৈরাগী আসিলে, লক্ষ টাকা ঘরে আসিল ভাবিয়া, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া, কত

শিক্ষা করি। যে কোন লোক হউক, নূতন কথা বলিতে আসে; মনে করি, যে কোন প্রকারে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া, না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হৃদয়ের ভিতর ভগবান্ শক্তি দিয়াছেন, সাধুসঙ্গে বসিবা মাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। বেশ বুঝিতে পারি, সাধু যখন নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া দিয়া গেলেন। আমি যেন তাঁর মত কতকটা হইয়া যাই। আমি জন্মশিষ্য; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না। সকলেরই নিকট হইতে চিরদিন শিক্ষা লাভ করিব; শূকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব।

হে সদ্গুরু, অনুগ্রহ করিয়া এ পৃথিবীতে অনেক শিখালে, অনেক দেখালে। অন্ন দিয়া যেমন শরীর পোষণ করিতেছ, আত্মার মুখে নূতন নূতন সত্যান্ন দিয়া তেমনই আত্মাকে পোষণ করিতেছ; ইহার জন্য ধন্যবাদ করি। আমার গোপন কথা কিরূপে ব্যক্ত করিব? প্রকাশ্যরূপে যে বলিয়া উঠিতে পারি না। তোমার কাছে বসিয়া অশেষ সুখ ভোগ করিতেছি। যত সত্য শিক্ষা করি, কতই সুখ হয়। নূতন সত্য লাভ করিয়া এত সুখ হয়, যেন হৃদয় পাগল হইয়া যায়; খুব চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়, প্রাণটা ছট্‌ফট্ করে। কেবল ভাবি, এ নূতন কথা কোথা হইতে আসিল, কে দিয়া গেল? ঠাকুর, গুরুর কাছে সত্য শিক্ষা বড় সুখপ্রদ। নিরাশ্রয় শিশুকে সুখই দিতেছ। মা, তোমায় ছাড়িয়া আর কোন গুরুর বাড়ী কি আমি গিয়াছি? স্কুলে পড়িয়া শিক্ষা শেষ করিতে কখনও কি চাহিয়াছি? টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হইবার কি কখনও প্রয়াসী

হইয়াছি? আমার প্রত্যাদেশ ঐ চরণে; আমার বিদ্যাবুদ্ধি ঐ পদধূলিতে। আমি অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হই নাই, তাই, মা, তুমি আমায় বেদ বেদান্ত সাহিত্য ইতিহাস সকলই শিখাইতেছ। মা যার সরস্বতী, তার বাড়ী যে ব্রহ্মবিদ্যালয়। তার মা ত কখনই শিখাইতে ভুলেন না। তুমি আমাদিগকে চিরশিখ্ করিয়া রাখ; আমরা কেবলই শিক্ষা করিব। সামান্য লোকের এত অভিমান কেন? অধ্যাপকের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন? সকলেই যে শিখাইতে চায়, কেহই যে শিখিতে চায় না। সুমতি দাও মনুষ্যকে; শিখিলেই শিখান হইবে। আর প্রচার করিতে যাইতে চাই না; সত্য আসিলেই আপনা আপনি বাহির হইবে। সত্য পাইতে পাইতে যদি ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়াও ফুরাইবে। অনন্ত বেদে যদি পণ্ডিত কর, তবেই বলিতে পারি, শিক্ষাও ফুরাইবে না, দেওয়াও ফুরাইবে না। সত্যের অভাব এ জীবনে কখনও বোধ করিতে হইল না। রাশি রাশি সত্য আসিতেছে। অবশিষ্ট জীবন শিখিতে শিখিতেই কাটাইব। শিষ্য হইয়া চিরদিনই তোমার বেদবিদ্যালয়ে পড়িব। নূতন নূতন শত সহস্র বেদ তোমার এই উপাসক-মণ্ডলীকে শিক্ষা দাও। দম্ভ নাশ করিয়া সকলকে বিনীত করিয়া দাও; যতদিন বাঁচিব, আমরা শিষ্যব্রত সাধন করিব; মুক্তিপ্রদ সত্য সকল লাভ করিয়া প্রাণকে সুশোভিত করিব; কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর; তোমার শ্রীচরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনৃত-খণ্ডন। *

আমার জীবন-বেদ পাঠ না করিয়া, সমুদয় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া, কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা মিথ্যাকথন অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। সে সকল মিথ্যা কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। জীবন-বেদের বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তদ্দ্বারা যে সমস্ত অনৃতবচনে দোষী হইলেন, সে সকল খণ্ডন করা আবশ্যক। মিথ্যাকথন দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে যাঁহারা একশ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইব? যাঁহাদের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাঁহা-দিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে, সেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণ-প্রার্থী হইয়া যাইব; জীবের সহায় হইয়া একত্র বসিতে চেষ্টা করিব না, এক আসনে বসিব না।

---

* এই উপদেশের তারিখ পাওয়া গেল না, সম্ভবতঃ ইহা ১৭ই পৌষ, ১৮০৪ শক হইবে। গঃ—

নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা, দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা, উপদেশ শুনিতেছেন যাঁহারা, সেই সকল ব্যক্তির আমি অন্তর্ভুক্ত। ইহাতেই আমার গৌরব; আমি তাঁহাদের নাম করিয়া পবিত্র হই, নৃত্য করিতে পারি, এই আমার সুখ ও শান্তি। আর যাঁহারা বলিলেন, এ ব্যক্তির চরিত্র নির্ম্মল, পাপ দেখা যায় না, সাধুদিগের মধ্যে এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাকথন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এ জীবনবেদে স্পষ্ট লেখা আছে, অনেক পাপ ছিল, ভয়ানক দোষ কলঙ্ক আশ্রিত ভাবে এ জীবনে পাপের মূলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কাটা হয় নাই। যাঁহারা সাধু, যাঁহাদের নাম করিলে জীবন পবিত্র হয়, আমার নাম সে শ্রেণীতে কেহ যেন মনে না করেন। এই যেন সকলে ভাবেন, আর দশ জন পাপী যেমন গুপ্ত পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আমিও তেমনই। তাহারা যেমন ভাল হইবার জন্য প্রার্থনা করে, আমিও দোষে গুণে মিশ্রিত। দোষ থাকা সত্ত্বেও অপরে যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পান, লোককে উপদেশ দিতে সাহসী হন, আমিও তেমনই সত্য লাভ করি, উপদেশ দিই।

আচার্য্য হইবার অর্থ এ নয় যে, পাপমুক্ত হইয়া আচার্য্য হইয়াছি; আচার্য্য হইবার অর্থ এ নয় যে, আপনাকে নির্ম্মল করিয়াছি, এক্ষণে অপরকে নির্ম্মল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি আচার্য্য হইয়াছি কেন? কতকগুলি রত্ন পাই, সেইগুলি অপরকে দিবার জন্য। কতকগুলি ভাব পাইয়াছি অপর সকলকে তৎসমুদয় অর্পণ করি। পাপাশ্রিত হইয়া, গুণসম্বন্ধে পরহিতসাধন মানসে আমি আচার্য্যের আসনে বসিতে লজ্জা বোধ করি। আমি অল্প অল্প স্বর্গ হইতে যে টুকু পাইয়াছি, সেই টুকু দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যদিও সাধু মহা-

পুরুষদের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, যদিও তাঁহাদিগের চরণতলে বসিবার যোগ্য নই—নির্ম্মলচরিত্র সাধুদিগের সঙ্গে, পবিত্র-চরিত্র মহর্ষিদিগের কাছে বসিবার উপযুক্ত নই, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি তাঁহাদিগের নাম সাধন করিয়া রিপু-দমনব্রতে ব্রতী; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং পুণ্য, শান্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে।

যাঁহারা বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন। বারম্বার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য, ইহাই বেদের কথা। এইরূপ দেখিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। এ ব্যক্তি অযোগ্যতা সত্ত্বেও একবার নয়, দুইবার নয়, শত সহস্রবার স্বর্গের সুধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সুখী করে—শত সহস্রবার দর্শন লাভ করিয়া জীবন পবিত্র ও দর্শন-প্রয়াসী হয়। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা সত্য কথা বলিলেন। যাঁহারা বলিলেন, এ ব্যক্তির ঈশ্বর-দর্শন ভ্রান্তি ও কল্পনা, বাস্তবিক এ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাঁহার কথা শোনে নাই, পৃথিবী তাঁহাদিগকে আজ নয় কাল মিথ্যাবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। আমি বাহিরের বস্তু সকলকে যেমন দেখিতেছি, ভগবানকে ঠিক তেমনই দেখিতেছি। ভগবান বলিয়া যাঁহার পূজা করি, বন্ধু বলিয়া যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার কথা শুনিতেছি। আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বর-দর্শন ও শ্রবণ তেমনই সহজ। ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী।

যাঁহারা আমার দর্শন ও শ্রবণ অস্বীকার করিলেন, তাঁহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারাও তেমনই মিথ্যাবাদী। ঈশ্বরদর্শন অসাধারণ পুরুষের পরিচয় নয়। ঈশ্বরের কথা-শ্রবণ [illegible] [illegible]। যেমন বাহিরের জড় বস্তু সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনই। তিনি যেমন ভাবান, তেমনই ভাবি; যেমন বলান, তেমনই বলি; যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনই প্রচার করি। তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ। আর যদি কোন গূঢ় দর্শন থাকে, তাহা হয় নাই। যেমন জড় বস্তু দেখা, তেমনই ঈশ্বরকে দেখা হইয়াছে; যেমন বাহিরের শব্দ শ্রবণ করা, তেমনই ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্যান্য যোগী ভক্তদের সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই। যেমন বাহিরের বস্তু ঠিক দেখি, বাহিরের কথা ঠিক শুনি, বিপরীত হইতে পারে না, ইহাও সেইরূপ। যদি কেহ মনে করেন, এ ব্যক্তি অন্যান্য লোকের ন্যায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, নানা অনুসন্ধান করিয়া, অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ করে, তিনি মিথ্যা মনে করেন। যাঁহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক কোন কোন পদে অভিষিক্ত হইয়াছে; ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহার সংসার চালাইতেছেন, তাঁহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। তাঁহারা মিথ্যাবাদী, যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি বুদ্ধি সহকারে ধর্ম্ম সকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধ্যবসায় সহকারে হিমালয়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে। এইরূপ আমার জীবনসম্বন্ধে কে কত সিদ্ধান্ত করিতেছে।

যে ব্যক্তি ছেলে মানুষের মত বিশ্বাস করে, কল্যকার জ ভাবিত হয় না, ধর্ম্মজীবন আরম্ভ অবধি সাংসারিক সকল চে হইতে বিরত, পরের মন্ত্রণা শোনে না, দশ জনকে অধ্যক্ষ করি আপনাকে পরিচালিত করিবার জন্য বিধি লয় না, আকাশে দিকে তাকায়, আর অন্ধকারের ভিতর হইতে যে সঙ্কেত আ তাহাই করে, সেই এই ব্যক্তি। এই একটী লোকের জীবনে পঁচি বৎসরে অনেক বড় বড় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি যে শু তৎসমুদয় পরাজয় করিয়াছে তাহা নয়; জীবনের ভিতর হইতে আলোক পাইয়া এখন বড় বড় বিপদের কাছে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছে। ঈশ্বর কেমন করিয়া মানুষকে চালান, এই ব্যক্তিতে তাহা অতি স্পষ্ট প্রকাশিত। দাঁড় লইয়া একজন চালান, একজন চালিত হয়; একজন ভাবেন, তাই একজনকে ভাবিতে হয় না। আমার জীবনের এই গূঢ় কথা যদি জানিতে চাও, তবে জীবন-বেদ পড়। এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী।

যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়। এমন জীবনের কথা অনেক স্থানে পড়া গিয়াছে ঈশ্বর পবিত্রাত্মা মনুষ্যের জীবনতরীকে চালান, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব বলিও না যে, আমাদের উপদেষ্টা জীবন-বেদে এ কথা প্রকাশ করায়, আপনার জীবনকে উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জন মূর্খ নীচ অবস্থার লোক হইতে পারে, অথচ ঈশ্বর দয়াময়ী মাতা ইয়া তাহাকে সত্যের পথে, সাংসারিক শ্রীসম্পদের পথে চালান। ার কে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ রেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী। আমি ধনী, মানী, জ্ঞানী, এ জ্ঞান মার নাই। সত্যানুরোধে আমাকে ধনী বলিয়া গণনা করা যায় ।। নিজের বাড়ী ছাড়া একটী পয়সা আছে বলিতে পারি না। দ কেহ আমাকে ধনীদিগের মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন, ভ্রান্তি বশতঃ য়াছেন; জানেন না বলিয়া লোকে আমাকে ধনীদিগের মধ্যে সিতে দেন। যাঁহারা গূঢ় তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে এমন উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন।

আমি আপনাকে যেমন ধনী বলি না, তেমনই নির্ধনও বলি না। যাঁহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারাও মিথ্যায় পতিত হন। দরিদ্র কে? যে কাঁদে, সেই দরিদ্র, সেই দুঃখী। দীনবন্ধু আমাকে সে দলে ফেলেন নাই, আমাকে সে শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। ধন না থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণনা করিতে পার, তবে সে ব্যক্তি আমি। পৃথিবীর ধনকে আমি তুচ্ছ বোধ করি। কল্যকার জন্য উদাসীন হইয়া, যাঁহাতে হৃদয়কে স্থির রাখি, আমার তিনিই ধন। আমি কেন ভাবিব? যিনি ভাবিবার, তিনিই ভাবিবেন। ধন আমার ভাণ্ডারে আছে, বাড়ীতে নাই। পিতার কাছে সকলই আছে। তাঁহার দেওয়া, আর আমার লওয়া কেবল বাকী। যাঁহারা ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রাখিয়া মনে করেন, আপনাদিগের পরিবারের জন্য অনেক

বিষয় রাখিয়াছি, ভবিষ্যতের দারিদ্র্য অসম্ভব করিয়াছি, মাসে মা
অনেক টাকা আসিবে, তাঁহারা মিথ্যা চিন্তা করেন।

আমার বিদ্যাও পৃথিবীর নয়। এখানকার সামান্য একজন বিদ্বা
যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহা আমি জা
না। যে জ্ঞান আছে, তাহা বলিতে পারি, এমন ভাষা বোধ আমা
নাই। সম্পূর্ণ বিদ্যা-শিক্ষা বিদ্যালয়ে হয় নাই। কৃতবিদ্যদিগের সহি
আমার তুলনা করিলে, সে তুলনা মিথ্যা জানিতে হইবে। বিদ্যা আমা
নাই। যাহা থাকিলে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা আমা
নাই। কিন্তু জ্ঞানে আমার ঔদাসীন্য নাই। আমি যে ঈশ্বরের কথা
জানি না, কি উপদেশ দিতে পারি না, তাহা নহে। একজন জ্ঞানী
আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই
শাস্ত্রীর শাস্ত্র শুনিয়া আমি বিদ্যা সম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি।
লজ্জানিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি
থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ব্যবস্থা করেন। আর
কে মানী? উচ্চপদস্থ লোক অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আলাপ
করেন। আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, তাহা হরির জন্য।
আমার মান হরির মান। পৃথিবীর মান পাই নাই, পাইব না
সুতরাং হারাইবারও আশঙ্কা নাই। পৃথিবীর কাছে কোন প্রকার
মান প্রাপ্ত হই নাই। ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান,
ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি। এখন এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কে কে
মিথ্যা বলিলেন, এ ব্যক্তির জীবনের অন্যায় অর্থ করিলেন, তাহা
সহজেই ধরা যাইবে। এখন সকলের এই মনে হওয়া উচিত, এ
ব্যক্তির জীবন যেমন চলিয়াছে, আমাদের তেমনই হউক। নিজের

ারা কিছু হয় নাই, হরিচরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরিচরণ ব্যতীত ার কোথাও জ্ঞান শান্তি পাওয়া যায় না, হরিচরণই সর্ব্বস্ব। এই ীবন-বেদের ইহাই মূল তাৎপর্য্য।

হে দীনবন্ধু, হে আশ্রয়দাতা, এ জীবনের পঁচিশ বৎসর তোমারই ক্ষী। এ জীবন তোমাকেই জগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি ার্থ হই। আমার জীবনে আমি কি করিলাম? পাপ করিলাম। মি কি করিলে? সমুদয় করিলে। সকল বিপদ হইতে উদ্ধার রিলে। আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, তুমি আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র াইলে। হে দীনবন্ধু, এখন একজন ভক্তকে স্বয়ং দেখা দিয়া র্থ কর। আমি পাপ বিনাশ করিবার উপযুক্ত নই, কিন্তু তুমি মার জীবনে কি করিয়াছ, করিতেছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে আমি ত আছি। আমার জীবন যে সোণার জীবন হইল। পরমেশ্বর, ার জীবনকে সোণার করিয়াছ। হৃদয়কে হীরকখণ্ড করিয়াছ। ন হীনকে এত বড় করিলে? আমি যে আগে পিপীলিকার গর্ত্তে তাম। এক একবার বাহির হইতাম, আর এক একটী চাল করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতাম। আজ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র তে বসাইয়াছ। কেন এমন হইল? ভগবান্ যাহাকে সুখী ন, সেই সুখী হয়। তুমি যাহাকে ধনী, মানী ও জ্ঞানী করিবার জ্ঞা কর, সেই কৃতার্থ হয়। এই জীবন-বেদ পৃথিবীর লোকে করুক, আলোচনা করুক। এ জন্য নয় যে, আমাকে সুখ্যাতি রবে। লোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে লইয়া অলৌকিক া করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না, এখন ঈশ্বর দূরে াছেন। হে হরি, আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত খণ্ডন করিয়া

যাই। লোকে এই ক্ষুদ্র পাপীর জীবন-বেদ পড়ুক। এক একা
শব্দ আলোচনা করুক। তাহাদিগের মনে তোমার প্রতি বিশ্বা
ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে টাকা কড়ি আনি
দিলে, তুমিই আমাকে জ্ঞান দিলে। তুমি কত করিলে, এখন এ
প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমার বেদীতে বসা যেন এই উপকার করে
যেন লোকে ভাবে, এ ব্যক্তি মন্দ ছিল, এখন কি হইল! ইহা
যে কিছু ছিল না, এখন এত হইল! আমার জীবনতরী কোথা
পড়িয়াছিল, আর আজ এ কোন্ ঘাটে লাগিল। এ যে বৈকুণ্ঠে
কাছাকাছি। এখন তুমি আমাকে যাহা বলাবে, আমি তাহাই বলি
যাহা করাবে আমি তাহাই করিব। হরি, আমি তোমারই। আমা
জীবন-বেদ পড়িয়া লোকে তোমাকে ভাল বলুক। এই জীবন-বে
পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রে
ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্বাদ কর।